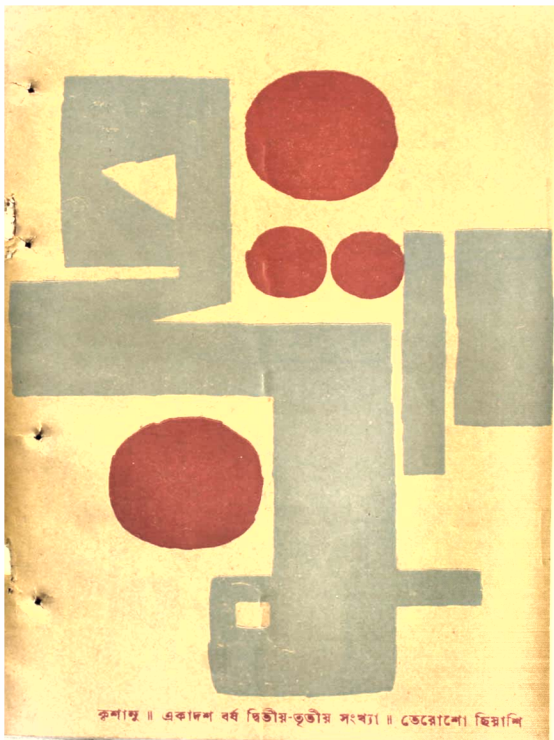




কলাশ্রু ॥ একাদশ বর্ষ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা ॥ তেরোশো ছিন্নাশি

সাবধান

জীবন বিপন্ন করবেন না

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন কোন সময় বিপন্নি তার হুলে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু হুলেও ঐ তারের ধারে কাছে যাবেন না। কোনরকমে ছোঁরা লাগলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে প্রাণহানি ঘটাবি বিচিত্র নয়। কিংবা প্রাণে ঝাঁপলেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে পারেন। নজর রাখবেন যাতে কেউ এ ধরনের তারের কাছাকাছি না যায়—গৃহপালিত জন্তু আনোয়ারদেরও দূরে রাখবেন। এ ধরনের মাটিতে দূরে পড়া তার ছেঁবে বোঝা যায় না তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কি নেই। বিদ্যুৎ কর্মীরা সব সময়ই এ ধরনের দুর্বিপাকের জন্তে তৈরি এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেন, তবুও যদি কখনও এ ধরনের পড়ে থাকা তার চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের নিকটবর্তী অফিসে খবর দেন। বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শীদেরও সাবধান করে দেবেন যাতে তাঁরা কেউ এ ধরনের তারের কাছাকাছি না যান—বিশেষ করে শিশুদের সাবধন রাখুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

কৃশানু

একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা। লকাল পরমা।

এককালীন চাহা ছয় টাকা। সড়াক আট টাকা।

বিশেষ সংখ্যার বহিষ্ঠ মূল্য গ্রাচকদের দিতে হয় না।

নমুনা সংখ্যার ভল্ল দুট টাকার ভাক টিকিট পাঠাতে হবে।

পাচ কলির কহ এজেন্সী দেওরা হয় না। এজেন্টরা ২৫% কমিশন পাবেন।

‘কৃশানু’ মূখ্যত নবীন লেখকদের মূখপত্র। ‘কৃশানু’তে রচনা প্রকাশের ভল্ল তদ্বির করতে হয় না। উন্নতমানের যে কোন বৌলিক রচনা প্রকাশের ভল্ল সামরে গৃহীত হবে। প্রয়োজনীয় ভাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোমীত রচনা ফেরৎ দেওরা সম্ভব নয়।

যাঁদের গ্রাহক চাঁদা শেষ হয়েছে, তাঁরা পরবর্তী বৎসরের গ্রাহক চাঁদা পাঠান।

কৃশানু

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির ৮নং ধারানুযায়ী বিজ্ঞপ্তি—

১। প্রকাশের স্থান—৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-২

প্রকাশের কাল—ত্রৈমাসিক।

৩। প্রকাশক ও মূত্রকের নাম—ঐমলিন দত্ত, জাতীয়তা—ভারতীয়,

ঠিকানা—রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ—বাটানগর, জিলা—২৪ পরগণা।

সম্পাদকের নাম—ঐদীনেশচন্দ্র সিংহ, জাতীয়তা—ভারতীয়,

ঠিকানা—গ্রাঃ + পোঃ—দৌলতপুর, জিলা—২৪ পরগণা।

৫। মালিকগণের নাম ও ঠিকানাঃ (ক) মলিন দত্ত, রামকৃষ্ণ পল্লী,

বাটানগর, ২৪ পরগণা। (গ) মহন দাস, ৬০/২, বামার্জী বাগান

লেন, হাওড়া-৬ (গ) হরিপ্রসাদ ভৌমিক, ঈ, এইচ ১/২১, বাটানগর,

২৪ পরগণা। (ঘ) দীনেশচন্দ্র সিংহ, দৌলতপুর, ২৪ পরগণা।

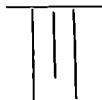
আহি, ঐমলিন দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, ১৫ই মে ১৯৭২

স্বাক্ষর—মলিন দত্ত

প্রকাশক

With compliments of :



TATA STEEL

With best compliments from

Cable VYABASAYEE

Phone 32-5154
34-1152

SWAPAN KUMAR SAHA

**11, AMRATALA STREET,
CALCUTTA-700001.**

With best compliments of :

PHONE : 55-2301

K. B. G. INDUSTRIES

Makers of :

ALTERNATORS. CONTROL SYSTEMS.
SOLENOIDS OF DIFFERENT CAPACITY.



Registered office

**13/1, CHIDUM MUDI LANE,
CALCUTTA-700006.**

কুশানু

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

একাদশ বর্ষ । দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা

নববর্ষ, ১৩৮৬

লেখক-মুচী

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

পিনাকীরঞ্জন গুহ

কবিতা

মদন দাস, শান্ত দাস, কেশব ভট্টাচার্য, রত্ননাথ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাংশু মিত্র,
বিদ্যাসুন্দর চক্রবর্তী, দীপক জানা, দেবদত্ত ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র মুনিরাম, সত্যল
চক্রবর্তী, অশোক মণ্ডল, আশিস চক্রবর্তী, মীনা ভৌমিক, তপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়,
অচিন্তা বসু, দ্বীকেশ বিহারি, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ।

গল্প

রত্নেশ্বর বর্মণ / নির্মলেন্দু বক্রিত / দেবপ্রসাদ মিত্র

গ্রন্থ-আলোচনা

প্রমথ সেনগুপ্ত, অম্বুপকুমার আচার্য, সাধন কুমার বসু

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র সিংহ

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্য পত্রিকার বিশেষত: ক্ষুদ্র পত্রিকাগুলির বর্তমান অবস্থা কপাল্লার ১-কায় দেবেই মানুস হবে। ১৯৭৮-এর শারদীয় সংখ্যার পর একাদশ বর্ষ খিত্যী-ভৃত্যী সংখ্যার দুখ প্রকাশ আট মাস পরে। ইতিপূর্বে মাঝে মাঝে যে পত্রিকা প্রকাশে বিলব্ব ঘটেনি তা নয়, কিন্তু এমন দীর্ঘ বিরতি গত এগার বৎসরে নৈব নৈব চ। প্রেস কর্মীদের কর্মঘণ্টা ও বিদ্যায় বিভ্রাটের দ্বাড়ে বোল আদা দোষ ঢালিয়ে বাস্তব অবস্থা থেকে পলারনের নামান্তর। দেশের অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রবহের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে, কি বিশেষকর অবস্থা নষ্ট হয় আমরা ভারতবাসী তার প্রত্যক্ষদর্শী ও ফলভোগী। রাষ্ট্রনৈতিক পুতুল নাচের অদৃষ্ট হৃদয়হরের কাগলাজিতে মূগ্ধ শিল্পনহ সকল স্তরে টঙ্কামতো মূল্যবৃদ্ধির যে অশুভ প্রতিবোধিতা চলছে তার সঙ্গে পালা দেওয়া চামচিকার চক্রলোকের দ্বারার মতোই অবাস্তব। বাংলা সাহিত্যের ভুত ও মধ্যস্থিত পত্রিকাগুলি অনেক আগেই সসন্মানে দেহ রক্ষা করেছে। টিকে ছিল বিস্তারিত 'লিটল ম্যাগাজিন'গুলি, আর বিস্তারিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি। অর্থনৈতিক বাস্তবতারের রামধাণীর লিটল ম্যাগাজিন বলতে আরও তেমন কিছু চোখে পড়ছে না। যে করধানী নিয়মিত চলছে তাদের খরচ কোন্ কূতে জোগার জানি না।

অনেক মধ্যস্থিত নিয়মিত ও বিস্তারিত সাহিত্য পত্রিকার অকালে লয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দু'একখানা সাপ্তাহিক বা মাসিক কার্যবাহী পত্রিকার ক্রমবর্ধমান রমরমা চোখে পড়ার মতো। তারা বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র ভাল ভাবেই রপ্ত করেছে। নাট্যবহের গলিঘুঁজি কাকফন্দিতে সাহিত্যরস বিস্তরণ করে বা অজ প্রত্যঙ্গাদি ববামালা, চাঁচাছোলা, রাধাচাকার ত্র্যয়াদির ফিরি করে সাহিত্যের না হোক, মালিকের কপাল কিরেছে। হুতরাং এক কালে যে বাংলা সাহিত্য কলিকাতা ছাড়িয়ে অনেক জেলা ও মহকুমা পহরেও চর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তা সব জায়গা থেকে পাতত্যাড়ি গুটিয়ে কলিকাতার দু'একটা বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে—যেমন নিজে পাড়াগাঁয়ের নিষ্পাপ মেয়েরা পেটের দ্বারে পহরের নিবিড় পাড়ায় আশ্রয়; ডিটেমারি ভেঙে হাজার হাজার নরনারী ফুটপাথে আশ্রয়। পাড়াবাড়ীতে বাস করেও বাংলা সাহিত্যের এমন বাস্তবতা নানা কোনদিন ঘটেনি।



দেখা হ'লে

অমন রান



দেখা হ'লে আমি তোকে নির্বাসন দেবো,

দিয়ে, নির্বাসনে যাবো ।

তোর অপেক্ষায়

চৈত্রবেলা উদয়াস্ত উষর, রাঙা ককচূড়া

মান, হরিপ্রভ হ'য়ে আসে,

বৃক্ষাটী নৃত্য মাঠে ঘুরে ঘুরে ওড়ে দীর্ঘখাল,

চিলেয় হতীক কণ্ঠ দীর্ণ করে নিঃশব্দ আকাশ ।

বৃষ্টি হয়নি, বৃষ্টি নেই,



এই শুষ্ক প্রকৃতিকে কি দিয়ে ভেজাবো ?

দেখা হ'লে আমি তোকে নির্বাসন দেবো,

দিয়ে, নির্বাসনে যাবো ।

বৃকের ভেতর কথা জমে জমে নিঃখাল নিখর,

যেন একরাশ বর্ষণ-উন্মুখ মেঘ ঢেকেছে প্রান্তর ।

মেঘের পড়ীয়ে শেব আঘাত দিয়ে বৃষ্টি করাবো—

দেখা হ'লে আমি তোকে নির্বাসন দেবো,

দিয়ে, নির্বাসনে যাবো ।



শিমুল

শান্ত রায়

কতোকাল পরে আজ উপলক্ষে দেখলো শিমুল—

পাঁচ মাস ? ছ' বছর ? একশো বছর ?

ফুটপাথে দোকান গাছের নিচে তার সঙ্গে

ছ' একটা কথা বলে শিমুলের মনে পড়ে

গত মাসে এক ভোররাত্রে

সপ্নে সে উপলক্ষে...

উপলের চোখ তার মুখ পেরিয়ে নিচে নেমে যায়

টের পেয়ে, আলতো করে সে-দিকে আঁচল টানে শিমুল,

অকণাভ'র সন্ধান

ক্রমশ ওর পেটের খোল বড়ো করছে।

অদূরে ওম্বরের বোকানে অকণাভ'র সবুজ জামা-পরা পিঠ

আর কালো প্যাণ্টের পাছা ও ঠাণ্ড।

'কেমন আছো ?' জানতে চায় উপল। সে-মুহুর্তে শিমুল ভাবে

সপ্নের কথাটা একে বলবে কিনা ;

ভাবতে-ভাবতে—'ভালো'।

তখন উপল বলে, 'চলি'। বলেই হাত নেড়ে

ছয়শ বাকের দিকে ছুটে যায়—

গড়ে হাত, পা-দানীতে একটা পা, অল্প পা-টা ঝোলে,

সহলা বুক কঁপে ওঠে শিমুলের—বাল ঘূরে যায়—

পেটের ভেতর কী দাকন আলোড়ন...

দাতে দাত, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বাধা সহ করে শিমুল।

শ্রেম

কেদার ভাড়াভী

বোড়শী রায়ের গালে চড় মেয়ে গিয়েছে পালিয়ে
আমাদের মন্টু বোব। বারা চেনে তারা আনে ঠিক—
চড় কেন ? আরো যদি খুঁজ লাবি পেটো বা ম্যান্ডিড
ছাঁতে বিভো তাহ'লেও বলা যেতো নিশ্চয়ই উচিত

বোড়শী রায়ের গালে চড় মেয়ে গিয়েছে পালিয়ে
আমাদের মন্টু বোব। তারপরে দিল্লী বিল্লী য়ে
এসেছে পাড়ায় ফের। কেউ বলে মন্টুকে 'ভিলেন',
কেউ বলে মন্টুকে 'ভেভিল'। আর কেউ কিহুদ্রে
গাড়ির গাড়ির দেখে, ভাবে বৃথি বলেছে পুলিশ :
ইউ মন্টু, ফাওন্, আপ ; ইউ আর আগার ম্যারেস্ট

তবুও পুলিশ নেই। আদালতে মাছি মারে আজ।
তু'মাল যেতেই দেখি মন্টু বোব রেজেষ্ট্রী অফিসে
শিল দিয়ে ট্যান্ডি ডেকে পাশে ব'লে বোড়শী রায়ের
হালিমুখে চলে যায়। বারা ছিলো বখাটে বালক
তারাত অবাক হয়। পরে কিছু বউভাতে গিয়ে
হাপ্স হপ্স খেয়ে ভেবে দেখে ডালোবাসা শ্রেম
বসন্ত মিশ্রণ এক বার মূলে লংকর সাহস
বুঁজি মেবা ধৈর্য বোধ...অলৌকিক...মাকড়সার জাল।

প্রোম

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

এটসব চিন্তায়,

ভেতর বাড়ীর মতো সজ্জিত হই।

গতিরী যন্ত্রের মতো অনবরত

একই নাম জপতপ।

ভালোবাসা অহংকারে বৃন্দ হয়ে থাকে ?

ভালোবাসা গৃহের ঘরের বউ

বড়ো বেশী লুকান্নিত,

পর্দা আড়াল।

ভালোবাসা আকাশের চাঁদ ?

পর্দায় আড়ালে আছে রীনা।

ভালোবাসা সোহাগ যেন পরীরে জড়ায়

রীনা কি ডেউরে আছে ?

ঠক...ঠক...ঠক...

ছিল সবার

দ্বিবাংগু মিত্র

আমার পাশে নাকি

ছায়ার মত ডঃ ছিল হাটার

আমার পাশে বাহুব ছিল ক'জন

তাদের গ্রাণে মদ্র ছিল হৃদয়,

এসব নাকি স্বপ্ন হয়ে গেছে

এসব নাকি গল্প কথা এখন

কিছু জানি একথা যায় থলা

হয়ত বাহুব কিংবা দুখের স্মৃতি

আমার মত অনেক গেছে সবার।

হিসাব

বিত্ত্যবরণ চক্রবর্তী

অনেকেই তো চলে যেতে হয়

এবং যার—প্রাত্যহিক

অস্থির

আহা আমার স্থিরের একবার

ভূবে যেতে সাধ হয়েছিল

অস্থির

নিয়ম জানো কি ?

যেমন বালকেরা—

বুধরা—

নারীরা—

নিয়মিত উদ্গার আসে

জ্বলিও থেকে জেগে ওঠে দাঁত

এবং দাঁতের কামড়—

সারাদেহে লণিল

অনেকেই তো প্রত্যহ ছেঁটে যার

এবং যেতে হয়

আহা আমার অস্থিরের একবার

প্রচণ্ড স্থিরের বান এসেছিল

নিয়ম মানো কি ? জানো ?

কতটুকু জান ?

চরম স্বভাবের মত কিরিয়ে নাও

ঠোঁঠ—

আমি কিন্তু প্রত্যহ আসি

এবং চলে যাই—

প্রত্যয় দীপক জ্বালা

বনন বেড়তে বেড়তে
বেলা বাড়ে,
বেলা বাড়তে বাড়তে
হৃদয় ঘোবন।

চারিদিকে ঠাণ্ডা মাঠ,
খেলার ইচ্ছা ভেগে ওঠে
খেলতে খেলতে
বেলা শেষ।

তখন সন্ধ্যার সংকেত,
বেজে ওঠে পাখ—
পাখের পল তন্তে তন্তে
পথ হাটি।
হৌচট বাই—খেতে খেতে
পল্লববলের দিকে...
এখনও শেষ হয়নি
আগামী লড়াই।

সুধুই হিসাব দেবদত্ত ভট্টাচার্য

এই বুকেতে মূখ রেখে সে হাসত প্রতিদিন
এই বুকেতেই ভাগ্যত অভিমান,
এই বুকেতে চুল ছড়িয়ে আরও আগ্রহে
গাইত বত খেলা ভাষার গান।

আজকে সে শু'কিয়ে গেছে সীমান্ত সংলাপে
আজকে যে তার নেইকো মোটে ছুটি,
বুকের মধ্যে শীত বর্ষা শু'ড়িয়ে গেছে লবই
করছে হিলাব চাল, চিনি ও কটি।

সমাজচিন্তা পূর্ণচন্দ্র মুনিসাম

স্টেটের উপর থেকে সমাজ চিন্তার ভাঁটাগুলো
ছোটকে পড়েছে বর্ণপরিচয়ের পাতায়
আমরা এখন বোল হয়ে বলে পড়েছি মাটিতে
কেননা আমি বাঁচি এবং থাকুক কলেকটরের প্রিয় ঘর
চাত পাতলেই যে টেবিল-ল্যাম্পের বাতিটা
বিনা বিদ্যায় নিজস্ব জ্বল পুড়ে পথে পথে পাথর সাজাবে
এ কথা কোন গল্পে যোঝান যাবে না

আমরা এখন পালিয়ে যাচ্ছি নিজের থেকে নিজের ঘরে
তিন-তিনটে শুভগ্রহের মৃত্যু-সংবাদ কাপাগলার কে বেন পড়লো
নবুটা বন্ধ করে আমরা এখন
বর্ণপরিচয়ের পাতার উপর কিছুক্ষণ আড়ল নাড়াব।

অহকারী সজল চক্রবর্তী

যে মাহুত প্রকৃত অহকারী
হয়
সে চেনে ফুলের
স্তবক
সে চেনে পতের কোথল পবিজ্ঞতা।

একদিন
তার উফতা স্পর্শ
পায়, বাসন্তী মৃত্যুর বৃক্ষে।

এইভাবে
সে হেঁটে যায়
পিচ্ছিল জ্যোৎস্নার স্রোতে ॥

কথা /

হুঃখ তুমি রথ সাজাও

অশোক মণ্ডল

রাজমুকুট ধূলে রেখে আমি ধনবাসী হবো

হুঃখ, তুমি রথ সাজাও ।

আজীবন বৃকের কোটোর পুখে রেখেছি ইচ্ছার ভ্রমর

যদি তুমি রাজী হও

সন্মানিত এট পোষাক ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে

মাটির আগনে বসে নিরাশার

ভোমার পাশাপাশি

ছেঁড়া বৃকপত্রে একাহারী সন্ন্যাসীর মতো

সেয়ে নেব আহার

যদি তুমি রাজী হও

ভোমার কাঁধে মাথা রেখে অনন্তকাল

আমি এঁকে যাবো হরিজ্ঞ আকাশের ছবি

মায়াবী সোনার হরিন কোল বেঁধে দাঁড়াশেও

আমি নির্মম প্রত্যয়ক

রাজমুকুট বে পরে পকক,

হুঃখ, তুমি রথ সাজাও ॥

ইচ্ছে ছিল সরিকটে বাবার

আশীষ চক্রবর্তী

ইচ্ছে ছিল ভোমার কাছে খুব নিকটে বাবার

অথচ কেবল ভাঙছ গড়ছ

বহুবর্ণে তৈরী হচ্ছে

খেলার মাঠে নতুন সাজে খেলার যানী হবার

ইচ্ছে ছিল,

ভোমার কাছে খুব নিকটে

সরিকটে বাবার ।

কারণার

মীমা ভৌমিক

লোকে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং
এই ভালোবাসা লিখ নহ / তার মানে পাপ ।
কিন্তু তোমাকে সরাসরি কোথায় ? কেমম ক'রে ?
তুমি অয়েছো আমার নাকিমূলে, যেখান থেকে তোমার
শিকড় নেমে গেছে আমার শরীরের নিয়ন্ত্রণে এবং
উর্দ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভালপালা লব ।
তোমার সবুজ পাতার ছায়ায় বলে আমি
নিঃশ্বাসে টেনে নিই, / শীতল ঝাটের শোঁধা গন্ধ ।
এই কারণার থেকে তোমাকে কি সরানো যার ?
বুগ বুগ ধরে টবরের একই নিয়ম—
স্বপ্ন করে নিজেই তুমি কারণারের রাজা ।

নদীর কথা

তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

লম্বা পেন্সেট নদীর কথা ভাবি
নদীর ধারে বাই ।

একটা নদীর পাড়ে তোমার লাখে
ঘণ্টার চাতার জলাং জলাং দিন
দ্রুপের সন্ধ্যা কাটিয়েছিলোম...
তুমি সেই নদীটা লুট করেছো...
আমি তোমার বাবা দিই নি...

ব্যাপারটা খুব মজার ছিলো. স্বয়ংক্রিয়, এখন-আমি
হুন্ লাসরের পাড়ে বলে
বু-বু বালির চতায় বলে
নদীর কথা ভাবি ।

ডাকাত তুমি রাজা সেজেছো কোথায় ?

আর তুমি প্রিয় কলহাস

[দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে]

অচিন্ত্য বস্তু

মাহুঘের অভিমানে অস্তিত্বের নীচে কয়ে গায়ে
 লকলেই জানার আনন্দে পাথরে ঘেরছে ছেনি, দুঃখ
 পণের মতো খিতিয়ে থেকেছে, আর তুমি, প্রিয় কলহাস
 বৈপরীত্যে অস্ত্র এক দুঃখের লাহিল বহুগায় দেখলে
 মাহুঘ, বুক'ডরা বাধা নিয়ে শুধু প্রেমিকের ছয় চাহনি
 থাকে চেনে, চিনে নিতে জানে লোভী কাচ, সেইভাবে
 মাহুঘের অভিমানে দিলে টান, অস্তিত্ব কাপলো
 একবার, হতো ছিঁড়ে যেভাবে দুড়ি ভেসে যায়.....

প্রিয় কলহাস ; শীত বৃষ্টি স্মরণে এই জাখে কেউ
 জাখার মাহুঘ নেই, তাই চূপ ;
 চূপ চ'লে গেলে ?

১

১

ঝুলে থাক।

জঘীকেশ বিশ্রাস

খুব বেগা করি গুতু ফেলি কিন্তু নিকেশ করতে পারিনা
এই শেষবার বলে চোখ রাঙাই নিজেকে সতর্ক করি
শাসন করি : 'চাবুক হাঁকড়াবো কিন্তু' ! কিন্তু ফের—
জালাধুখে কলো লাথর ! দায়ভাগ যেন আমার !
হুড়িয়ে-বাড়িয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তেতে-পুড়ে বরে কিয়
সেই লোভশেড়ি ! ক্রুক চোরাগড়ে পরতান খুঁচী
কেন অষ্টপ্রহর আমার মাথার মধ্যে ! কেন গী
গী জালা...হিস্ হিস্ নখ প্রতিহিংসা আর নিজের
লগ্নে নিজের প্রাণর...আঘাত। বিজিরি ? ধাটামো
না কি ? সংসার নেই আমার। আমি তছনছ
করতে চাই আর পোড়াতে চাই এই আবু। হায়,
যেহেতু পারছি না সেহেতু লব্ধকণ ঝুলে থাক।

তুমু বন্দনার নয়

জীবেন বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমু বন্দনার নয়, সংকল্পে রেখে সাথে

ভালোবাসা তো নিশ্চয়ই ;

তোমার অনলিতে যদি পেতে চাও অধিক কিছু

তবে অসমাপ্ত কোন কিছু রেখে না তুমি,

তুমু বন্দনার নয়, স্বচ্ছ-ও রেখে নিজেকে

চেতনা সবুজ তো নিশ্চয়ই ;

দেখবে, হাসতে হাসতে কেটে যাবে দুর্বল বীজ

বিবর্ণ ফুল রূপ পাবে পূর্ণতার

অনন্ত প্রকৃতি ছাপ রেখে যাবে বহুতার

জটিল অঙ্কুর তার কালো পোষাক

খুলে ফেলে

উপহার দেবে এক অপূর্ব জ্যোতির সত্য ।

বন্দনার যদি ফোটাতে চাও সত্যের ফুল

বন্দনার যদি খুলে দিতে চাও পৃথিবীর অপর দুয়ার

তবে,

তুমু বন্দনার নয়—অন্ততঃ সাথে রেখে

সংকল্প ও স্বচ্ছতা এবং ভালোবাসা ও সবুজ চেতনা ॥

বাংলা গল্পের জীবনযাপন পিনাকীরঞ্জন গুহ

এক

মনে পড়ছে, সামিক বন্দ্যোপাধ্যায় এতদা নিজে লেখা 'অতীত মানো' গল্পটিকে 'উভাসময়' এবং 'নিহক পাঠকর' মন-ভাল'লেন' বিশেষণে চিত্রিত করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত: এই সত্যতাই একজন সাধারণ মানুষ বেড়ে লেখককে হতর যাত্রা এমন দেয়। জীবনযাপনের গভীরতা যখন গভীরতর হয় তখনই লেখক নিজার বেচে আরো বেশী খুঁজে পড়েন। বোধ হয় এই রকম সময়েই লেখকের মনে হয়—তিনি যে লজ্জ সাহিত্যে এগেছিলেন, তার কিছুই করা হয় নি।

সম্ভ্রান্ত জীবনের তীব্রক তাৎপর্য অতুলন করাই যে কোনো সত্যিকারের লেখকের উদ্দেশ্য। বাংলা গল্পের বিগত প্রায় শত বর্ষের আলোকচিত্র অসংখ্য তাই প্রকাশ করে যে, আমরা অগতি না হলেও কিছুদূর যাত্রা সেই রকম লেখক পেয়েছিলাম। এবং পেয়েছিলাম বলেই বাংলা গল্পের উচ্চারণযোগ্য একটা কৌলীনা আছে।

এই প্রায় শতবর্ষের ইতিহাসে বিভিন্নমুখী দীর্ঘ নিয়েছে বাংলা গল্প। নিবিড় জীবন, নিবিড় রাজনীতি এবং বাস্তব আধুনিক জীবনের বহু ঐতিহ্যের তলায় নিত্য শিবিল উদ্দীপক রোমাঞ্চের ফসল গাঁড়োও যে নেই তা নয়। অস্ত্রাঙ্গ জীবন, নহন আবার, শ্মির অস্ত্রাঙ্গের খনন এবং মনন, বাস্তবের উত্তরাধিকার, হুমি বধনের বিস্তৃত ভূমিকা আর সেই সঙ্গে আইডিয়ালিজম—কমুনিজম—ভার্গালিজম যেনো অগল অল্পভূতির বিভিন্ন বর্ণমালার সম্বিত বাংলা গল্পের চরুত্ব। গল্পের সীমানার ভূগোলের সম্ভ্রান্তারণও লক্ষ্যণীয় হয়েছে সন্দেহ নেই। এগেছে ক্ষত প্রবহমান ইতিহাস। প্রনী সংগ্রাম—প্রতিক্রিয়ানীলতা, চিত্রাচরিত প্রেমভাবনার রিয়্যালিটির ধারণা কোকর্ম, ক্রাসটেশন আর মরবিডট এবং মধ্যবিত্ত দুঃখ—জীবনের দুঃখ নীরঙ ছবি আর ভঙ্গুর বাগনা, বোম্বারী, প্রেমের দিব্যবস্ত্র এবং সব শেষে অনিবার্য গল্পহীনতা এসে গেছে বঙ্গদেশ বাংলা গল্পের সম্বরণে। গৌণ জীবন থেকে যৌন জীবন ইত্বক তার ঘাওয়া আশা টলেছে এবং আন্তর্জাতিক যৌনে বড় শু কয়ে নেওয়ার একরকম বাসনাও। অর্থাৎ একটা মৌনিক যাকবান দেখা দিচ্ছে অবশেষে।

এই সুদীর্ঘ সময়ের গল্পে হঠাৎ আলোর স্পন্দনিত্তে কখনও বা জল-গুঁড়া সেই প্রোকাইল নেই। অথচ তাকেই আশ্রয় ছোট পল্লভাষ। আর কোন পূর্ণতা থাকে না, থাকে অনিশ্চয়ের অপূর্ণতা। কেন না কোনো নির্ধারিত 'শেষ'-এর জন্য নয়, গল্পের আসল চাবিকাঠি তার শুরুতেই, যেখান থেকে সেই অপরীতির উদ্ভাসনটুকু সঞ্চারিত হয়েছিল। কস্মি বয়ে জল উঠে নিভে বাওয়ার মহাবতী, উপগ্রহগেই গল্পের ভিত্তিহীন।

এসব সমভাবে বিগত তিন চার দশকের বাংলা গল্পে সেই অপরীত প্রোকাইলও অনেকবার উদ্ভাসিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর বিনুখল পটভূমি তার বিবিধ সমস্যার জরিরিত হয়ে সেই ভাঙাচোরা বৈশিষ্ট্যেই উপস্থিত হয়েছিল বাংলা গল্পে। বেশ বিভাগের দাক্ষ্য সমাজজীবনে যে দাপ পড়েছিল, তাও অল্পপস্থিত ছিল না। এই সববে পত্র-পত্রিকার কল্যাণে গল্প শিল্পের নেশা লেগেছিল মধ্যবিত্ত বাঙালী মানসে। পত্রাশয়ের বছরগুলিতে গল্প কবিতা নিয়ে নিয়মিত বিভর্ক, আলোচনা, সভা এবং গ্রন্থ প্রকাশ রীতিমত বিন্দুস্বরূপ। এই সময়ের বাংলা গল্পে যন্ত্রণা, যৌনবোধের আতঙ্ক, এবং বিংশ শতকের সঙ্গে সঙ্গে চলন গল্পরীতির নানান-নিগীক। 'কলোন'-এর দ্যুত জরুরী অবস্থতির অব্যবহিত পরেই কয়েকজন স্বতন্ত্রাণী গল্পকাহের প্রবেশ বাংলা গল্পের সমুদ্রকে নাড়ুয়ে প্রতিষ্ঠা করলো সংস্কার নেই। সস্তর দশকের একেবারে প্রত্যন্তেও তাঁরা কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ মশালের মতো বিকিবিকি জগতেন। তাতে একেবারেই যে উজ্জলতা এবং তাপ নেই তা নয়। কিন্তু প্রায় তিন দশক ধরে অবিরাম ধারা বাংলা গল্পের মধ্যবিত্ত সংসারটির দায়-দায়িত্ব বহন করে এসেছে, তাঁরাও তো যোগ্য উত্তরপুরুষের আশা করতে পারেন! এবং সেই আশা কোনভাবেই অমূলক নয়। কিন্তু তুলনামূলক বিস্তৃত এই সংসারের স্বাক্ষর বজায় রাখবার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

বাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা গল্পে আরও ব্যাপকতার পর্ব শুরু হয়। গল্প লেখা হতে থাকে পর্বাণ। বহিরঃকর কলা-কুলতায় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নব্য লেখকদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই আঙ্গিকের চটুলতা খুব যেদীর্ঘ বাঙালী পাঠককূলের আকর্ষণ বাড়তে পারে নি। যদি এবং যেভাবে এই সময়ে অধিশাশন গল্পই খুব অধির। তবে তার মধ্যেও কিছু লেখক বাংলা সাহিত্যে অদ্বৈতীয় হয়ে থাকবার দ্বির প্রত্যয় বজায় রাখতে এসেছেন। তাঁরা প্রত্যয়ের জলে পা তানিয়ে শেওরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

আর কেনেই তাঁদের একধরনের নিজস্ব বর্ণন পনের অবধানে হস্ত তত্ত্বালন বিভ্রম করেছে। এইসব দার্শনিক প্রতীতি গড়ে উঠবার পিছনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যৈত প্রভাব তো আছেই, তাহা'ক' আছে বর্ণনের বিবিধ দ্বারা উপধারায় মিশ্রণ। সেই মিশ্রণে ত্রিগাথকক এবং নীৎসও আছেন। আছেন মার্কস—মাও-সে-তুও এবং ত্রিঅরবিন্দ। চারিত্রিক বহুমুখিতা এবং পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনের চলচলুর সঙ্গে প্রবহমান যে কোনো ইচ্ছা খুব সহজেই বাংলা গল্পে এসে গেছে। কোনো বিষয়কেই গল্পে অগ্রবেশ্ত মার্কস এঁটে দূবে সরিয়ে রাখা হয়নি। নিটলু ম্যাপারিনও'লিকে কেন্দ্র করে সহরের এক একটি ব্যবসানে গড়ে উঠল অগ্রজের উদ্দেশ্যে বন্দনা এবং বিরোধ। বিবিসিমানস হুঁকে বেরিয়ে-পড়া হঠাৎ বহুংকর অনেকেই তখন লেখালেখির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন। প্রত্যয় এবং প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এই তরঙ্গকে অস্বীকার করা যায় না। সাময়িক তাত্ত্বিক তো বটেই, উত্তরকালের দিকে তাকিয়েও এই তরঙ্গ খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

অসীমতা—ত্রিবাংসা—বড়গল্প—হত্যারাজনীতি-দুনীতি এবং পরিমিত কচিরোধ আর নীতিনির্দেশের মূল কারণ হচ্ছে জনকটির অবিকল প্রতিচ্ছিত্রের প্রতি অকারণ স্পর্শ। এই সময়ের সাহিত্যে অস্বিকৃত্যের সঙ্গে পরিমিত বোধের অভাবও চূড়ান্তভাবে লক্ষ্যণীয় বস্তু পরিমিতিবোধ কথটির আপেক্ষিকতা এবং বিতর্ক থাকতে পারে তবে বাংলা গল্প সাহিত্যের কমনসবনে মস্ত হাতীর অনস্বিকার প্রবেশ যে একেবারেই ঘটে নি—তা বলব না।

যাত্রা দীর্ঘকাল বাংলা গল্পের শিশিটে দিক্‌বদল প্রদীপন হয়েছেন—বঁদের কলমে গল্পের বিভিন্নদার্শনিক সংজ্ঞা নতুনভাবে চিহ্নিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ ও সৌজ্য আলাপে অপসংবাদ সমর্থ, অতিক্রমতা এবং স্রষ্টার দিকে অতীতের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

সুবোধ বোধের একটি উক্তি মনে পড়েছে—‘অস্বিকৃত্যের বিশ্বের অবস্থা বিশ্বকর এই অনিরম অচূত হয়েও জীবনের যত নিরমিত মগ্নতার চেয়ে অনেক বেশী মধুর।’ এবং এই কথার দানিক পরেই তিনি লিখেছেন—‘মাহুকের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আনন্দের মধ্য যে ঈশ্বর-বিবাস, তার স্মৃতিয় প্রেরণার অল্পপত বিশ্ব ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রূপায়িত করে এতদিন কেন অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিনি, নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ আজ একটি কষ্টকর আক্ষেপ হয়ে মনের ভিতর বাজে।’

অসামান্য স্বীকারোক্তি পেয়ে যাজ্ঞি সর্বোৎসাহে ঘোবের লেখা থেকে, যেটি দু'বই বৎসর; 'সেই লেখক আজ নিজের স্বপ্নের, কাছে ছুটি নিয়ে নিছক এক দুখোঁড় কলমনবিশ।' মেলেনি চলেতে চেয়েছিল যে, সে আজ নিতাই এক মালগাড়ির গাড়ি।'

তৃতীয় উদাহরণ নিকি, সময়ে সময়ে বহু লেখা থেকে—অমেনিয়ন এখন আমার নিজের ভিতর থেকেই উৎসারিত, আগন্তু আমার রচনা ও ব্যক্তি মানসিকতার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। এই নিরন্তর বন্ধের মধ্যে আমি বাঁচি। পথের ঐকান্তিক যেক, অতএব কোথায়? সত্য মেলেনি অত্যাঁচ।'

উদ্ধৃতিগুলি লেখার প্রাতি লেখকের আত্মাত্মিক চক্রের প্রমাণ করে।

দুই

বাংলা গল্পের প্রতিটি বাক্যই বেশ কয়েকজন গল্পকার এক একবারে এসেছেন। উনিশশো তিরিশ থেকে চলমান সময় পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা গল্পে নতুন নতুন লেখকদের আবির্ভাবের দিকে তা করে আপাতভাবে কয়েকটি স্তর নির্ণয় করা যায় (মালোচনার শেষে সংযোজিত)।

স্বীকৃত পরবর্তী বাংলা গল্পে অর্থাৎ উনিশশো তিরিশ থেকে পরিত্যক্ত সাল পর্যন্ত যে কয়েকজন গল্পকারের নাম উল্লেখ করা যায়, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বাধীনভাবে চিহ্নিত। 'কল্লোল' যুগের লেখকরা তো বিশিষ্টতার এক একটি নিকি, তাছাড়া ছিলেন অগমী গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অরুণাচল রায়, বিদ্যুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোজ বসু। 'কল্লোল' চিহ্নিত পর্বের উজ্জ্বল এবং পরিপূর্ণতা এনেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আংশিকভাবে প্রবোধকুমার সান্যাল। এবং বিচ্ছিন্নভাবে বনমল আর বিদ্যুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

এই পর্বের বাংলা গল্পে রোমান্সবিরুদ্ধ প্রতিবেশ সৃষ্টি এবং প্রমোদবিরোধী মাহুদের আবেগোপনিবন্ধ রচনাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। তবুও এই সময়কার গল্পে নাট্যকারের নিঃশিষ্ট সত্ত্বও নাটকীয় ঘনঘটা ছিল। ব্যবহারিক বাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্কুরিত সত্ত্ব গহন অবগাহী ব্যক্তিত্ব এবং টাইল, বাক্যভঙ্গিমা আর সংলক্ষিত সূচক অভিনিবেশ। পরিপূর্ণমনস্ক লেখকরা চোখ এবং চরিত্র আর মন এবং মনের বিশ্বাসের সমাবেশ ঘটাতে লক্ষ্য হয়েছিলেন। এই

পর্বের অধিকাংশ জলের তিতিকৃষি পাক হলেও তাতে সর্গজননস্বিত পতন
প্রস্তুত হয়েছিল।

চরিত্রের দশকে বিশ্বব্রাহ্মণীতির বনিকা পতনের প্রতিক্রিয়া। সেইসঙ্গে
ঐক্যবাদের দল পুনর্গঠন। মহাদেবের সঙ্গে বিবিধ বস্তু। দশর বিবিধ,
দুর্ভিক্ষ, দাশ এবং সুখাত দেশবিভাগের পূর্ণাঙ্গ পটভূমিকাতোই রচিত সেই
দশরকার মাহুয়ের ঐক্য-বেদ। বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ জুড়ে সেদিন শুধু পাক আর
ঘা'টি, খব আর কয়-সুগার হাটাকার এবং যৌনবাদি ও অব্যাহিত জীবনের
বিভূতি। সেই Age of dwarf-এর নিখিহ দেওয়ালের পাশে মাথা কুটে
বিপ্লবিত গণের জ বনাধন রচিত হোল গলে। কত জয়াবহতার তুলনার
পদ্মা মেঘনা। অক্ষপূর মহানদীর জীবারের ডে'পু আর শিউলির গছে কিশোর
বয়সের নাছোড় নীলজিয়ার বিশেষভাবে আ ান্ত হলেন অনেক লেখক।
দেশবিভাগের সেই কামা বাংলা গল্পের শত শত পৃষ্ঠা অবিকার করে রেখেছে।
লজিতা ক'ব' বলতে কী, এই সময়ের বাংলা গম ব'ব'প্রদানের বিতর পরিমণ্ডল
ধে' মুক্তির আশায় একটু দিক্ত শু হয়ে পড়েছিল। শির কলমে
শিল্পের হৃদয় কঠিনপাথরের কোনো পূর্বকতি ছিল না। তবে শান্ত মান-
বে তহাল এবং প্রকৃতি পর্ববেকপের ধারাটি জায়গায়ে চিহ্ন হতে
পেরেছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজস্র মূল্যবান গলে।

এর পর চরিত্রের শেষে এবং পকাশের শুরু থেকে বাংলা গল্পের ব্যানভাগ
সুই বিভূত। এই সময়েই আমরা সংখ্যার দিক থেকে বিখ্যাত উজ্জল
লেখকদের সন্ধান পাই। বাংলার অংকেই 'লজিত' চলন 'খনও নিরুপ
জা' সংরক্ষণ কনটেট এং কর উভয় কে'জই অব্যাহিত গৈতিব এই
পূর্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হা'নৈতিক স'চরিত্র এবং ব্যক্তিমা-বের প্রতি
সুখ ব'বীরা দৃষ্টিভঙ্গি সমভাবে জিহ্বাল হতে দেখা যায় সমাজ-
সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় ব'র্শনিকতা' আন্তর সচাচরিত্র। সংখ্যার এবং
খাতো সচাইতে উৎসর্ঘের এই সময় বাংলা গল্পের ইতি দে বিবৃৎ আপন
নিরে থাকবে সন্দেহ নেই। দ্বারা নিঃসন্দেহে এই পর্বে সর্বাঙ্গীণ সুবলভার
পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা ভিত্তিহীন এবং শরীরে 'খনও ভিত্তমান। সতীনাথ
ভ'তড়ী, ব'গোব'ব' জ্যোতিষ্মিত নকী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ,
বিদ্যন মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপন গোপূরী, বিমল কয় সম রণ বহু
গ্রন্থ। কোনো কোনো গল্পকার বিবরণস্বর বৈপরীত্য এবং ভাষার কাকতলি

একই সঙ্গে ভরসী মনে করেছেন। সেইসঙ্গে গল্পাভিত্তিক বিষয়ে প্রতি-
 যনোযোগও এই সময়ের বিশেষ লক্ষণ। বিশেষী লেখকের স্বপ্নের এবং
 সাহিত্যের কন-বন্যী প্রভাবও জাতে অজাতে বাংলা গল্পে স্থান নিয়ে
 কলছে। পরিবেশ এবং প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে এই সময়কার বাংলা গল্প
 যথেষ্ট সাহিত্যিকতার পরিচয় দিয়েছে। বুদ্ধিগামী দৃষ্টিভঙ্গির অতি দ্রুত
 অগ্রগতিতে এখনও কখনও গল্পের সামগ্রিক অস্তিত্ব তারামা হারিয়েছে, এ কথা
 অস্বীকার্য। বহু বর 'ইকম'-এর নামে অনাবশ্যক চর্চতা এবং দ্রুতগতি সৃষ্টি
 হয়েছে। পোট-সম্প্রদায়িক, কিউ বসম্, কিউগারিজম্, বোয়েমিয়ানিজম্
 ইত্যাদির সংস্পর্শে লেখকরা কেউ কেউ 'সেমি অ্যাডভান্সি' বা 'সেমি
 অ্যাডভান্সি'। সংক্রমিত অ বাগুর চলচ্চিত্র কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাণ্ডকারী
 হলও সত্যমানে তা বাংলা গল্পের পক্ষে দরকারী ক্ষমতা নেত পায় নি।
 অতিরিকালের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। একজন পরপূর্ণ আত্ম-
 নিবেদিত লেখকের প্রাণের প্রাণের এতাল অত্যন্ত সামগ্রিকতার আঁচড়। এবং
 লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ অবগতি থাকে না।

এই পর্বে কিছু সময়ের অগ্র একাধিকে রইলেন বোয়েমিয়ানিজম-
 ভরণ—নবোৎপত্ত—মোহাভা এবং অপরদিকে ছায়াপাত করলেন আত্ম-
 —জা। পল সাজ—ক্রান্তি কাণ্ড—খালসোয়ার কাণ্ড—কলন ডাইলগন
 প্রমুখ বৈদ্যনী লেখক। বাংলা গল্পের লেখক এবং পাঠকও এই পথে
 করলেন। এক পক্ষে বোয়া পেন সামগ্রিক মনোভঙ্গিতে বহিষ্কার এবং
 প্রগতিশীল বিপ্লববাদ আর অপরদিকে উন্নত হোল অগ্রগতি এবং
 নিষ্কর চেতনা প্রবাহ, সাইকোপ্যাথিক স্মরণাত্মকতা এবং নিঃশব্দতা।
 অর্থাৎ প্রগতিশীল একদিক স্মরণে বহু এবং অপরদিকে বিদগ্ধ বহু।
 এই দুই দিকেরই অনেক লেখক মশকো শুরু করলেন। কিন্তু অগ্রগতি
 জীবনানতি নিয়ে জানানোকে কখনও পরিণাম বরা যায় না, পক্ষান্তরে
 নিজেই দাখলভুক্ত পাঠক হতে হয়। অনেক তরুণ লেখক এই পরিণতি
 দেখে নিঃশব্দ। তারা একবারও ভেবে দেখেন নি যে, ১৯৭৭ বাংলার
 বঙ্গবাসিনীতে সংশোধন বহু বিব. বিমল এর উদ্ভাসিত হন নি, তার নেতৃত্বে
 'সমুদ্র পাখানোর' স্বপ্নকালীন রক্ততা আছে। আত্মরপ বা অত্যন্ত এবং
 প্রতিপাক বা অগ্রগতির উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি বহু। আর, বিমল এর এই
 জীবনানতির সঙ্গে পরপূর্ণভাবে মিশ্রিত, বিশেষে বিরুদ্ধে তার রচনার।

সামান্যই তাঁর কাছে পূজা এবং জীবন। ক্রপণী চেতনার সঙ্গে প্রবর বাস্তবতার আন্দর্ভ মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় মিলন কবীর গল্পে। গল্পের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে এখন তেমনক এং অল্প বয়সক ব্যবহারে সঙ্গবদ্ধ: আর কোনো গল্পকার লাগাতে পারেননি। তত্ত্বগতের চৈতন্যে পাণ্ডাপাক-ভাবে মিলন কর আদর্শ নিয়ে গিয়েন। এই সময়ে তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা গল্পে একধরনের 'স্থলি' তরু হোল। কিছু অল্পকাল বাদে তাঁর জীবনই মজার যে, খুব দ্রুত তাঁর বিকৃতি এসে যায় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণে গাঁড়িডা বেঁধেই থাকে এসেই পড়ে।

তবুও স্বল্প অগ্র-পর্যায় উত্তীর্ণ হয় বাম ক্রোমান কোমো: একক। হেঁচ থাকেন সত্যসং অপ্রত্যক্ষ মাধ্যম। সামর্থে এক পালকের আরও পাখী এসে সমবেত হয়। সেখান মাধ্যমেই জীবন এবং জীবিতার সন্ধান চলতে থাকে। স্বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মতি-স্বা, বিবোন্দু পালিত, দীর্ঘেন্দু মুখোপাধ্যায়, হুদা গঙ্গোপাধ্যায়, স্রাবণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঠে হুদ মুস্তাফা সিরাফ এবং অন্তিম বাক্য-পাখ্যায় বাট থেকে সত্ত্বের মধ্যে নিজেদের সজ্জার নির্মাণ রাখিল করেন। পর লোটার ব্যাপারটিকে মিহক রাখা-খাল বা নিত্যক বাহাদুর মনে করে জীরা বা লাগাতো আদর্শে নি।

'প্রোফেশনাল খর্চি' কথাটি খুবই প্রচলিত, এখন এই গলে খেলোয়াড় এবং লেখকরাও হুক্ত। তখনতে খারাপ লাগলও সমসাময়িক অবস্থার পতি-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বানিয়ে গেছে। বাটের পর থেকে 'প্রোফেশনাল বা টার' কথাটির তাৎপর্ষও তাই পৃথক। ব্যাপারটা এখন অনেকটা কৌলীকের তরুণর মতোই অমূল্য। এখনকার নামা লেখকরা উত্তর অর্ধেই বেঁচে থাকার ক্ষমতা লেখেন।

কেন-এরশন-প্যাণ্ড-এর বহুবিধ ব্যবহার এই পর্বের লক্ষ্য। ফর্দে-কেনে কাঁড়াবাড়ি তরুর দিকে দেবা গেলেন তা বেশী দূর টেকে নি। তবে লক্ষ্যের বস্তুকের তুলনায় এই সময়ের বাংলা গল্প খুব বেশী উচ্চ-বস্তু-বস্তু-বস্তু আত্মগত। যেনে নিরেছে। কেননা, কনস্টে-এব নিত্যনতুনত্বের অবকাশ ক্রম দিল্লি-বান তদুমান বি-বিরি-বস্তু থেকে দেবার এবং উপ-বস্তু কবীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান জীব-ধারণার উদ্ভাবিত এবং অবকর বাজাতিবিক্রমাবে বাংলা গল্পে ছাড়াপাও করো। সেইসঙ্গে এসেছে নামাধিক থেকে অস্ত্র-বস্তু সংকট এবং পুনো কঠোরতার প্রত্য অন-বা। নগর-কেন্দ্রিক গল্পের আধিক্য বস্তুটা সেই জুনার প্রা-ব-বস্তু 'বহুবিধ

নিজাই নয়ন। অ্যাংলাভিটি এঃ নিউসিঅ্‌ম্‌ খানিকটা থাকলেও তার
 কৃমিকা খুব বিকৃত হতে পারে নি। বরং অ্যাক্টিবাইমেজের বৌক সব
 দিকেই লক্ষ্যণীয়। অ্যাক্টিমে-২ যতো অ্যাক্টিটোরিও তাই দেখা যায়।
 বোটের ওপর সত্বরের দশকে এসে উদ্ভ্রান্তি এবং ইমপোর্টেড কালচার
 আবৃত্তি নগরহীনের প্রতিচ্ছবিই বাংলা পঃঃ সাময়িক হিতি।
 কবানে পূর্বসূরী কোনো আদর্শ গল্পকাহের প্রভাবও তেমন কার্যকরী নয়।
 বিশ্লেী অহঙ্কতির বাবঁতার সবে সহর সিমিত সৃষ্টিও প্রয়াস অমেকায়েশ
 বিকৃতি লাভ করেছে। তাই বাটের লোকরাই পরবর্তী দশককে ছাড়িয়েও
 জীবন্ত। নতুন স্রোত তাঁদের আত্মলাং করতে পারে নি কোনভাবেই।

ষাট সাল থেকে লিটল ম্যাগাজিনের প্রাচুর্য খুবই লক্ষ্যণীয় বিবর। বাংলা
 সাহিত্যের আধুনিক যজ্ঞ-মেজাজের নিয়ামক এই পত্রিকাগুলি থেকেই
 লোকনের সান্নিধ্যে উঠে এসেছেন অনেক লেখক-শ্রবি পঁচাত্তরের পর থেকে
 লিটল ম্যাগাজিনের দুঃসম। শুরু হয়। যে সব অনিবার্য কারণে পত্র-পত্রিকা
 বাধাগ্রস্ত: বহু হয়ে থাকে, তা ব প্রায় সব কাগজেই এখন খুব প্রবল। যেদখ
 লেখক-কবিরা জীবিতার দিক থেকে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত নয়, শুধুমাত্র
 লিটল ম্যাগাজিনে অনিঃশ্রিত আত্মপ্রকাশের পর তৃপ্তিই তাঁদের সম্ব। তাঁ দরও
 কেউ কেউ গল্প রচনার নিঃসঙ্গ নিষ্ঠা এবং অধিবাস্ত বকমের অধা সাহ বোধিয়ে
 থাকেন।

তাঁদের সৃষ্টিতেও বৈচিত্র্যের উজ্জলতা এবং বৈদগ্ধ্যের দীপ্তি সমভাবে
 ক্রিয়াশীল। সত্যতাও বিভিন্নমাত্রিক বিবর্তনের খোলস ছাড়িয়ে নিষাধ
 বাহির নামক প্রাণীর আত্মাহুসজ্জানই তাঁদের লক্ষ্য। কেননা, বহু বছরের
 নিরীকার মানসিঃ তাঁদের সন্তিপথকে সংকীর্ণ এবং ক্রমশঃ ক'রে লিচ্ছে
 স্বাভাবিক ভাবেই। ইয়েলো আর্নানিঅ্‌ম্‌ এবং উত্তেজঃ সাহিত্য সৃষ্টির
 কটক। বাজার বতই অঃ উঠুক, সেই কৃত্রিম প্রজন্মের কাছে নতি স্বীকারের
 বাধ্যতায় এখনো আসে নি

এখানে লেখকদের উত্তর এবং খাঁতির সময়সীমা লক্ষ্য রেখে অল্পপূর্বিক
 একটি তালিকা সংযোজ্যত হল। সৃষ্টির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা না থাকায়
 রচনা তালিকা হয়তো পরিপূর্ণ হতে পারল না। সেজন্য আমি ক্ষান্ত।

১২৩০—১২৪৫

শ্ৰেণেশ্বৰ মিত্ৰ, অতিথ্য সেনগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানক মুখোপাধ্যায়, কমলীণ গুপ্ত, অন্নবান্ধৱ বাবু, বুদ্ধদেৱ বৰুৱা, বিকৃতিচূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাৰ্য্যবান্ধৱ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রমুখ।

১২৪৫—৫০

সত্যনাথ ভাৰুজী, সুবোধ বাগ, জ্যোতিৰিঙ্গ নন্দী, নৱেশ্বৰনাথ মিত্ৰ, কল্যাণকুমাৰ বোৰ, সুবোধন মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্ৰ, হৰিনাৰায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বাৰ্ণালুৰী দেৱী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাৰীশ্ৰনাথ বাগ, বৰদাশৰ চৌধুৰী, গৌৰকিশোৰ বোৰ, ১২৫৩, বিমল কৰ, নাগেশ্বৰ গঙ্গোপাধ্যায় নৰেন্দ্ৰ বোৰ, গোপাল হালদাৰ, সমৰেশ বসু, ননী ভৌমিক স্বৰাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ৰীনিধি জানা, মিহিৰ আচাৰ্য প্রমুখ।

১২৫০—৫০

বীণেশ্বৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বতি নন্দী, যশোবন্ত দেৱী, কমলকুমাৰ বসুৰাৱৰ সতীশন, চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন ভৌমিক, কবিশঙ্কৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিৰ লাহিড়ী, কেশৱ ৱাৰ, প্ৰহ্লাদ ৱাৰ, যশোবন্তীৰাম ভট্টাচাৰ্য্য, স্বৰেন গঙ্গোপাধ্যায়, মিহিৰ সেন, শান্তিৱৰ্ত্তন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিপাক্ষ পাণ্ডিত, অশীম ৱাৰ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্ষয় হালগুপ্ত, চিত্ত সিংহ প্রমুখ।

১২৫০—৫৫

শীৰ্ষক মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিদ্দিক, বুদ্ধদেৱ গুপ্ত, মিলিল সৱাগৰ, সতীৰ মুখোপাধ্যায়, শ্ৰীনিধি গঙ্গোপাধ্যায়, মিহিৰ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন আচাৰ্য্য, অৰবিন্দ গুহ (ইন্দ্ৰমিত্ৰ), কলীচূষণ আচাৰ্য, অক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, অমিত গুপ্ত প্রমুখ।

১২৫৫—৫০

স্বৰাশু বোৰ, অন্ন ৱাৰ, সতীৰ বৰুৱা, তুলনী সেনগুপ্ত, অশোককুমাৰ সেনগুপ্ত, প্ৰণৱ সেন, শেখৰ বসু, কণা বসু মিত্ৰ, বিৰ্মল চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বোৰ, শ্ৰীনিধি বাগ, বীৰেশ্বৰ বসু, কমানাথ ৱাৰ, সমৰেশ বসুৰাৱ, দুৰ্জয় সেনগুপ্ত প্রমুখ।

১২৫০—৫৫

সতীৰ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়কুমাৰ বোৰ পট্টন বাগ, শৈবাল মিত্ৰ, যশোবৰ্জ্জন বসু, উৎপল চক্ৰৱৰ্তী, অমল আচাৰ্য, বাণীৰত চক্ৰৱৰ্তী, ৩তম ভট্টাচাৰ্য, দীপাতি বসু ৱাৰ, কল্যাণ বৰ্মা, জ্যোত্স্নাথ বসু, শ্ৰীৰামেশ্বৰ মৈত্ৰ, প্ৰভাণ বসু, অশীম চক্ৰৱৰ্তী, মহম্মদ বাগ, দিলীপ সেনগুপ্ত, শংকৰ বাগ, দুৰ্জয় ভৌমিক, ভাৰ্য্যবান্ধৱ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

একটি অলৌকিক বিড়াল

রত্নেশ্বর বর্মণ

বিড়ালটাকে যখন আমি নর্দমার ভেতর থেকে তুলে নিয়ে আনি, সে ভয়ন নিভাত্ত হোঁট। সেই দিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। ভীষণ শীত। হাড়কাঁপে। আমাদের মফঃস্বল শহরে ম্যা-মাঘে যেমনট হয়। হু হু হাওয়া বহাছিল সারাদিন। রাত্রেও তার বেশ ছিল। হুড়কট সন্ধ্যার পরেই লম্বাট কনপুল, বে বার বার ঢুকে পড়েছে। আমি সম্বোরে মাইকেল চালিরে আগছিনাং, অজ্ঞা চেয়ে, রাজি নিয়েম বুক 'বলটা' বিড়াল ছানাং করল এবং মর্মস্পর্শী িংকার আমার কান এলো। আমি হয়ণু ব্যক্তি নই, পরোপকারের বাঁও আবার নেই সাধারণত এই সময় তু কাতিতুহু ব্যাপার-স্তাপারে মাথা ঘামাই না কিছুতেই। কিন্তু সেদিন কেন এনটা কেমন হের গল, কম। বরা-বরা ভাব আমি মাইকেল থেকে নেমে কারার উৎস সন্ধানে প্রবুঃ হলাম। অবশেষে অনেক কষ্টে বিড়াল-ছানাটাকে খুঁজে পেলাম। নর্দমার জলের মধ্য অর্ধেক জুড়ে আছে। স্নেহাৎ পেল, কোতুকাংর শতের আমোদের শিকার হয়েছে বিড়াল-ছানট। এখন শান্ত-জলে ঠক ঠক করে কাপছে।

আমাদের বাড়িতে এর আগে আমার কখনও বিড়াল-কুকুর পুঁথিবি। বড়ত কুকুর-বড়াল পোষার কোন প্রয়োজন আবারা বোধ করন। এবং এই বিড়াল ছানাটাকেও পোষার মতলবে আমি আনি ন। যা প্রথমে একচোট নিলেন। এমনতেও দারুণ শীত, তারপর রাজি এগারটা পর্যন্ত আগে থাকা। আমি নিভাত্ত কাচুম'চু হয়ে গেলাম, কেন চুরির দায়ে থকা পড়েছি। তাই নিজ হাতে ওখানে ত্রাকড়া দিয় থেকে পরপাটি রবে ধোঁলাম। আবার বরের এককোণে থকা চাপা দিবে শুইয়ে দিলাম।

★ অজিঙ্কল পরিবেশেই মনঃ কর্ম করতে হয়, এই ভেবে কিছুটা আশ্বস্তমানক বোধ করলাম। বলা বাহুল্য, রাতে সুনিদ্রা হল।

সকালে টেঁচা মচিতে ঘুম ভেঙে গেল। বানের গম—মাগো বেধে বাত, বিড়ালছানাটা কী করছে। সঙ্গে যাবের গলাও শোনা গেল—না, বিড়াল আলার বাড়িতে টেকা দার হয়েছে। বিড়ালটাকে ডাড়া।

তারপর যাবার ডিড়ালানার কাগা শোনা গেল বাগানে। আমি কখনো থেরা না করে বাড়ি বেচে সটকে পড়লাম! য় পলায়িত প জীবতে।

★ এরপর বেশ কয়েকদিন বাড়ির অনায়ে—কানাচে ডিড়াল ছানাটার আশ্রয়িতা করতে পেলাম। আড়াল থেকে দেখতাম, সে সবের আলোকে রাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আমি মিসুর গলার পরজাতি ডিড়কর এবং লাঠি হাতে বিড়াল ছানাটাকে ডাড়ানো। এটা আমর কাছে দারুন মজার ব্যাপার হয়ে হল। মিসু আচ্ছা জ্বা হয়েছে। আমি মিসুর রাগে অরও হজর কোণাশয়—এই, অমন বাজখাই গলার টেঁচাবিনা। যতবোড়ি গেলে দাডকা দুখ করবে।

★ মিসুর অবাধতা খুব সুখস্বাদ্য হবে না কেনে তখন রণে তখ দিয়ে অজ্ঞাতর ফিকে রঙনা হতাম। মনে মনে ভাবতাম, বিড়ালছানাটাও আচ্ছা ছাংলো, যেহা পিত নেই। অমন মরমরের পলো করে করে আসে। সাথে কী আর বিড়াল বলে!

★ সেই ছুরো-বিড়ালছানাটা যে কী করে খুরো হয়ে গেল, তার একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। এক শুনিবে যে, মিসু বিড়ালছানাটাকে ডোলের আল দিয়ে খান করছে। বড়ির সকলেই তার ওপর প্রসন্ন। ঘটনার বিবরণ জানা গেল বিড়ালছানাটা বাবার ঘরে বসে ছিল। মা ঘরের দেওয়ালে ছেলান বওয়া খওয়ার পাসপত্রো মানতে গেলেন। কিন্তু ঘটনা লক করে ফেলেন যে, বিড়ালছানাটা আলনের দিক ঠিক পেতে আছে, লোক পাড়াজে এবং বড়বড় আওয়াজ করছে। মায়ের সন্দেহ হল লাঠি দিয়ে আশ্রয়ভালকে বেজরান থেকে টোল কেঁপে দলন, দেবলন। এটা বাচ্ছা মাপ কদকল করছে। পরে জানা গেল, ওটা বেউটে মাপ। বাচ্ছা কটুট।

★ এই ঘটনার পরেই বিড়ালছানাটার রাজকায় সমারোহে আমাঝের বাড়িতে অভিব্যেক হয়ে গেল। আমাঝের নামকরণ করে দলম 'রাঙা'। কেননা বিড়ালও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মামা। খুঁড়ি, মালী নয়, 'বেলোমলাই,

কেননা বিভাগছানাটা ছিল 'ছলো'। আমি খুব প্রসন্ন দুটিতে ওর বিবেক তাকিয়ে দেখলাম—বিভাগ ছানাটার রং বহিষ্ঠ হুৎকুটে কালো, তবুও যেখানে হুৎকুটের কোন বসে। আমাদের সমস্ত পরিচর্যার গাথের রং চক্চক করছে। ওর সাহসে মিছ একটা কাটি নাড়াচ্ছে আর হাজ, সরোষে সেই কাটির ওপর কাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ধরছে, লেজ পাকাচ্ছে। কখনো ছেল পা নাচ্ছে পৌঁ পৌঁ করে আঙাঙ্গ করছে।

এখন রাজা আর মাটিতে বসে না, চত্বারে সোফার বসে থাকে এবং মায়ের বিছানার ঘুমোয় এবং ঘুমলে বড় বড় করে আঙাঙ্গ হয়। নিরামিষানী মায়ের বাটে এই মাছ-কোকা বিভাগের অবস্থান লতাই আন্দরের। মা রাজার প্রদ্রবংলা কিছুতেই পছন্দ করেন না এবং সর্বক্ষণ রাজার প্রশংসার পক্ষপাত। রাজা ছাড়াই পর ইংলওলো হাটের টাইট হয়ে গেছে। এখন আর লক্ষ্যের অলক্ষ্যে আমা পেরিওলা হুটো হয়ে যায় না এবং আমাদের বাড়িতে মোড়তা বিভাগগুলোর সমাগম হয় না। ছুৎকার ছ-একটি যে উক হুৎকুনা দিয়েছে এখন ময় হুৎকু রাজা এমন প্রল বেগে ওদের তাড়িয়েছে যে তারা ভরে আর এম্বা হয়নি। ততাই মাছ-ছুর নিগাপতা খিান করা গেছে, এ নিশ্চয়ই রাজার উদ্দেশ্যোপায়। অতীকার করার কোন উৎসব নেই। মিছ কাছ পেতে জানা গেল, রাজা মাছ পাওয়া দেয়, যায় না। আমি বিদগ্ধ করিনি। মিছ আমার অধিবাস ভরন করল একদিন। দেখলাম, জতি রাজা ভাআ মাছের পাশে বসে আছে চোখ বুঁজে অণীম বৈরাগ্য। আমি অবস্থিত মাছভাআ পেলে আমিও লোক লয়ন করতে পারতাম কিনা জানে। দেখছি, বিভাগ তরী কখনো প্রচলিত অর্থটাই বুঝি পাওটে যায়।

আমাদের গোণের সাহসে সেই ছোট বিভাগছানাটা এটা বিভাগলপু হুৎকু-বিগে পরিণত হয়ে গেল সাধারণ কিছুদিনের মধ্যে। রাজা আমাদের পরিবারের একজনই হয়ে পড়েছিল ক্রমশঃ। সর্বক্ষণ তাকে বাড়ীতেই পাওয়া যেত। হরতো সোফার বসে আছে কিংবা সাহসের লনে দুর্বাধাদের ওপর লটার করে লন-গাথ করছে। আমাদের কার পায়েল লম্ব পেলেই সেই ভাবিতী পলাই ইং ইং ও ডাক এবং হেবা গেল রাজা তার লেজটাকে বাড়া করে আমাদের পায়েল পাশে পাশে ছুচ্ছে। আমাদের পায়েল লম্ব ওঠ মাথা বসছে। আঙা হাঙার ব্যাপায়েও তার নির্দিষ্ট ব্রাহ্ম ছিল। আঙার অঙ্গ খাল-বাটিও

আলাদা ছিল। রাজার কোন আচরণের সামান্য সমালোচনাও য' সন্ধ্যা করতে পারতেন না। ওর অনাশ্রিতা যখন এমনি ভূমি সে তখন সকলের অগোচরে একাদমি নিকর হ'ল।

সে যখন রাজ্যে থাকার নির্ধারিত সময়ে রাজাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কখনো কখনো এপ্রিয়ানো বা এমনি কোন অস্বাভাবিকের জন্য রাজার ভাষন বিষয়ে অ-সচ্ছা দেখা যেত। সকলের অসুস্থমান, এমনি কোন কারণে সে ভাষন বয়কট করেছিল। উচ্চৈশ্বরে ডেকেও যখন রাজার সাজা পাওয়া গেল না, তখন সকলে সে রাজ্যের অন্ত নিরন্ত হ'ল। আশা ছিল রাজ্যেই কিংবদন্তি আসবে।

কিন্তু সময়ের সময়ও আশাকে বাধ করে দিয়ে পর যখন সে হাফির হ'ল না। তার পর দিনও না। তার পরেও না। যা থাকণ ছইকই করতে লাগলেন। আমিরেও যে একটুও বাগান লাগছিল না, এমন নয়। শুধুত কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, যেন একটা শূন্যতা। যা আশে পাশে শাড়া ঘুরে দেখলেন। চেনা জানা লোকদের জিনিস করলেন। শেষে হাতের কাছে আশাকে পেয়েও কিছু উচ্চা প্রকাশ করলেন—কি যে করিল সারাদিন, কেবল অজ্ঞা, বিভ্রান্তি যে কোথার গেল। 'ইত্যাদি ইত্যাদি। যা বাক্সা, বেকার থাকার এমনি পেরে, বিভ্রান্ত খুঁজে বের করার কাজটাও আমার ওপর বর্তাল। দীর্ঘদিন কেলাম।

যা বললেন—হলো বিভ্রান্তলো বয়স হলে ঘর ছড়ে চলে যায়। কী জান, বয়স বিভ্রান্তের মনেও বৈরাগ্য লগার হয় কীনা। অবশ্য পুত্র ব'হুধের মনে বৈরাগ্যের মজাদিক্য থাকে, সময়সীমা মহিলাদের তুন্দর। এর কোন নৃতাত্ত্বিক কিংবা জৈবতাত্ত্বিক কারণ আবার জানা নেই। আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই রাজ্যের ধারে আবর্জনার পাশে বসে নাথেরা নাথেরা বিভ্রান্ত-গুলোর দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাইতাম। যদি রাজাকেও সেখানে কোন মহিলা বিভ্রান্তের পা চাটতে দেখা যায়। কে বলতে পারে! এবার আছে — মুনিনাক মতিভ্রম।

সীতার প্রত্যা। র্তনের সময় অশা ছেড়ে দিয়ে আমরা বন তার বানপ্রস্থের বিংবা অরণ্যভ্রমের সম্ভাব্যতাকে মনে প্রাণে স্বীকার করে নিলাম, তখন তার আতর্জব ঘটল একাদমি অচমকা একেবারে মধ্যাজে। আশার বাইরে প্রচণ্ড িংকারে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে গেল। যা শাকিয়ে উঠলেন, আনন্দ-বিগলিত কাণা গলায় বললেন—ও হ, রাজা এসেছে। আশিওর কেলাম —রাজাই বটে। তবে যেন আদেকার রাজা নয়। চেহারাটা কিংবা কখন,

কল্যাণের ছাপ, ছরতো বা। তবে সমস্ত অবস্থাবে অধ্যক্ষগণেরই ছাপ। চোখ দুটো দ্বিগুণ, শাশব নিঃশব্দতা চলবল করছে। রাজা একটানা ভেঁকেই চলল অনেক। গলার স্বরও কঁকণ। যা বাগার মিলে, সে তাজিলাতের একবার ডাকেরও দেখল না। এমনি নোংরা বিড়ালকে মা বিছানার তুলসেন না। রাজারও সেরকম কোন অভিজ্ঞতার প্রকাশ পেল না। সে প্রথমে দরজা কাঁক করে বেড়িয়ে বাগার চেঁচা করল। তারপর খানিকটা চোখাঘেঁচি করে পাশোলের ওপর জটিল ট মেরে শুয়ে রইল।

চমকপ্রদ পণ্ডা শুরু হল এর পরে। পরদিন সকালে দেখলাম, মা দরজা বন্ধে রাজ্যের আন করালেন। আজ্ঞা মেয়ে বাড়ি কিয়তি, দেখে আন্দাজ হলাম যে, রাজা ছাইগাছার মধ্যে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে দিয়ে আঘাতের শূন্যে। দুইলাল, রাজার বিলাস-ব্যাপন ইত্যাদির ওপর আসক্তি নেই কিছুমাত্র। বাবার সময়ে গ্রেটে ভাত মেখে দেওয়া হল আপেকার মতো। রাজা অবহেলা করেও সে দিকে একবার ডাকিয়ে দেখল না। আমি মাটিতে মুঠো করে ভাত দিলাম, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে খেল। মা বললেন—একবারে অংশঃ হয়ে গেছে।

লম্বোদরের বাবুজির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাজা অগোচরে গেল। কখনো দরজার পাশোলের ওপরে, কখনো খাটের ডালার মেঝেতে, কখনো ছাইগাছার বিলম্ব করতে থাকল। অবশ্য সে নিঃশব্দ একাকীই রয়ে গেল। নাড়ার নোংরা বিড়ালগুলোর দলে ভিড়ল না। এবং খিদে পেলে এমন চিংকার জুড়ে দিত যে, তাকে ওরপেট না বাইরে বাড়িতে টোকা দায় হয়ে থাকত। আমি বললাম—একটা আপন ছুটেছে। আমার অভিযতের সঙ্গে বাড়ির অন্য সকলের অভিযতের দাপন মিল লক্ষ্য করা গেল।

এখনো অনেক বাগী ছিল আভে আভে দে-সমস্ত প্রকাশ পেতে লাগল। একদিন পানের বাড়ির আছ-খোঁদি এসে অভিযোগ করলেন—মালীমা, আপনাদের রাজা আমদের সব দুখ ধেরে নিয়েছে। এর চেয়ে বক্রপাত হওয়াও বৃহি আন্দাজ ছিল। রাজার বিরুদ্ধে চৌকবৃত্তির অভিযোগ।

মা আবলই বিতে চাইলেন না, বললেন—ও ধেরেছে দেখেছ ? —না তো, তবে সকালে ও আমাদের রান্নাঘরে ঢুকেছিল। খেতে দেখেনি, সুতরাং প্রমাণের অভাবে অব্যাহতি হয়ে গেল।

পরদিন আর এক পাশের বাড়ির বি এলে বলল—ঠাকুরমা, তোমা:

ধের স্বাধীন আত্মাধের ভাষা মাছ সব খেয়ে নিয়েছে। —খেতে ভোরা
 বেবেছিল? অথবা একই ধরনের—না, খেতে দেখিনি। তবে ও আত্মাধের
 স্বাধীনতার সামনে ঘুবিছিল। সুতরাং প্রমাণের অভাবে এবারও অব্যাহতি
 হয়ে গেল।

কিন্তু চারদিক থেকেই অভিযোগ। রাজা চুরি করে বাবে, এমনি
 অধঃপন ওর হবে তা আত্মাধ বিবাস করতে পারছিলাম না। এমনি নিত্য
 নতুন অভিযোগ আসতে থাকল স্বাক্ষর নামে চারদিক থেকে। কিন্তু সবই
 সম্মুখের বলে, রাজাকে বম্বাস কেউ ধরতে পারেনি এখন পর্যন্ত।

এরপর আত্মাধের পাদেই বাথ পড়ল। মাছ কুটে বেবেছিল কুড়িতে
 করে। খানিকক্ষণ বাবে দেখা গেল, এক টুংগোও নেই। আমি গোয়েন্দার
 মতো সকলকে জিগোস করলাম—রাজাকে রাজ্যের কেউ বেবেছ? সবাই
 সম্মুখের বলল—না। বেখলায়, রাজা গোলাপ গাছের তলায় সটান হয়ে
 ঘোঁষ পোছাচ্ছে। ঘেন কোথাও কিছু হয়নি। পৃথিবীটা আগে ঘেনন ছিল
 তেমনিই হয়ে গেছে। রাজা আত্মবাস ডাবলে কাছে আসে না। দারুণ
 চরিত্রিত। সুতরাং আত্মাকেই ওর কাছে খেতে হল। ওর গৌরব-ধ্ব
 বেখলায়, মাছের আঁপ লেগে আছ কিনা। না কিছু নেই। বরং ও আত্মাকে
 ঘোঁষে হাঁও মাঁও ডেকে কিত্তি সোছাগ জালিল।

কিন্তু মাছ দুখ উধাও হওয়া স্বাধীনতা চলল। বরং এতটু বেশী যাত্রাভেই।
 আত্মাধ সবলে দারুণ চিত্তার পড়ে গেলাম। নিজেদের কতি তবু স্বাক্ষর
 করা যায়। কিন্তু প্রতিবেদীদের অভিযোগ, অসহ। যা বললেন—একে বিবাস
 কর। বৃহতে পারলাম, আত্মাধন বধন করেছি আমি, বিবাসনের স্বাধীনতাও
 আত্মাধেই। কিন্তু বধন কোন ধোঁষ প্রমাণ করা যাচ্ছে না, শুধুট সম্মুখের বলে
 বিবাসন, আত্মাধ বুদ্ধিমত্তা মন কিছুতেই যায় দিল না। অথচ প্রতিবেদীদের
 আত্মাধের প্রতিবিধানও আত্মাধ সাধারণত মনে হল না। এদিকে ইদুর
 বাহিনী নিত্য নতুন উপক্রম চালাতে লাগল। আত্মাকে আমা হুটো বরছেত,
 কালকে প্যাট। কখনও কখনও চলতে লাগল ইদুরদের দীর্ঘ শোভাযাত্রা।
 অথচ রাজা উদ্বাসীন। বেখলায়, রাজা ছাই-এর গাদার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে,
 পরমানন্দে সবচেয়ে আত্মাধের ব্যাপার দেখলাম, সেদিন দুপুরে। সবাই
 ঘুমুচ্ছে। রাজা ধানের তলায় শুয়ে আলস্যভরে লেজ নাড়াচ্ছে আর গোটা
 জিন চারেক নেটী ইঁদুর ওর গায়েব ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে বেলাতুল।

করছে। বাত-বাতকের এমন বিচিত্র সহাবস্থান শুধু অরণ্যভেদের কাহিনীতেই পড়েছি। এবার মনে মনে স্থির করলাম যে, রাজার সংসার বাসের যেসব আর বাড়ানোর কোন মানে হয় না। ওকে এবার বিদায় করতেই হবে।

তবু ছু-চারদিন কেটে গেল, কিছুটা অবলোম্ব, কিছুটা আনন্দে। শেষে রাজার নির্বাণনের দিন বার্ষ হল। সবলেই মন ব্যাথাপ হয়ে গেল। আমারও। বহিঃ আমি ওপর ওপরে তড়পাতে লাগলাম যে, দয়া-মায়ী ইত্যাদি বিষয়ে আমার বিনুৎসঙ্গ আসক্তি নেই।

রাজাকে আমি সংক্ষেপে বৃত্তা বন্দী করলাম। সে প্রাণপণে চিংকার জুড় দিল, আক্রোশে ব্যস্ত ভেতরে ঝাঁচড়াতে লাগল। ওই বৃত্তাটাকে নিয়ে আমি তিনটে ট্রেনের পেরিয়ে এক ট্রেনে নামলাম। এদিকে জনবলতি খুব কম, চারদিকে গাছপালায় হারুণ জটল। অনেকটা বনের মতো। সেখানে বস্তার মুখ খুলে দিলাম এবং রাজা এববার আমার দিকে তাকিয়ে লাক দিয়ে ছুঁয়ে সরে গেল চিংকার বন্ধ করে দিল। আমার মনে পড়ে গেল, সীতার নির্বাণন কাহিনী। খুব ব্যাথা লাগল। ছোটবেলা সীতার কাহিনী পড়েই, আমার চোখে জল এসে যেত।

যে চূরির অপরূপে রাজার নির্বাণন হল, সে চূরির আমরা বেউ তাকে করতে দেখিনি একবুক অপরাধ নিয়ে, আমি একরকম পালিয়ে এলাম সেবান থেকে। ট্রেনের আগুনের ফাঁকে ফাঁকেও রাজার সেই অলংকার আর্দ্রনাথ আমি যেন ভনভে পাচ্ছিলাম। বাড়িলে এলে যা জিজ্ঞাসা করলাম—এম্মেই, ছেড়ে দেওয়ার পর রাজা কাঁদছিল? আমার বিরক্ত লাগছিল, বললাম—জানি না। যা জনাটিকে বললেন—কেই কেটেই বিড়ালটা মরে যাবে।

সেদিন অমাবস্তা, তারপর সন্ধ্যার পর থেকেই লোভলোভিৎ, কেমন গাঃ মঃ হাব। আমি যন্ত্রের মধ্যে রাজার ডাক শুনছিলাম - ওয়া, ওয়া। সে কোণ-কাড়ের মধ্যে কুঁচকিয়ে চিংকার করছে। বাতিলের রাজার চোখগুলো অন্ধকারে টেরে আলোর মত জ্বল জ্বল করত। ক্রমশঃ চিংকারের আগুণ অন্ধকারে বাড়তে বাড়তে মনে হল, আগুণজটা আমায়ের ঘরের চারদিকে ঘুরছে। এক সময় বিড়াল কুঁচ চিংকার চারদিকে গমগম করতে লাগল। আমি খুবচোখে বহানীর মনে পড়লাম। মনে হল, অস্ত সকলেই লেগে উঠেছে, কিন্তু সাদা মিছে না। আমি নিম্নিতে পাওয়া লোকের মতো গিয়ে দরজা খুললাম। ডাকলাম—রাজা। রাজা তেমনি উচ্চগ্রাণে চিংকার করতে করতে আমার

জনতে পাচ্ছিলাম। বাড়িতে এলে যা জিজ্ঞাসা করলেন—এ্যাট, ছেড়ে দেওয়ার পর তাকা কীহুছিল? আমার বিরক্ত লাগছিল, বললাম—জানিনা।

যা জনান্তিকে বললেন—কৈরে কেটেট বিভালটা মরে বাবে!

সেদিন সমাবশা, তারপর সন্ধ্যার পর থেকেই লোড-শেডিং, কেমন পা ছনচেয়ে চাব। আমি বপ্তের মধ্যে রাজার ডাক শুনছিলাম—ওঁরা, ওঁরা। সে কোপহাতের মধ্যে ক্রুদ্ধভাবে চিংকার করতে। রাজিবেলার রাজার চোখগুলো অন্ধকারে টেঁচের আলোর মত জল জল করত। ক্রমশঃ চিংকারের আওয়াজ বাড়তে বাড়তে মনে হল, আওয়াজটা আমাদের ঘরের চারদিকে ঘুরছে। এক সময় বিভালের ক্রুদ্ধ চিংকার চারদিকে গমগম করতে লাগল। আমি ঘুমচোখে বিভানার বসে পড়লাম। মনে হল, অল্প সন্কেট ভেগে উঠেছে, কিন্তু লাড়া লিচ্ছে না। আমি নিলিতে পাওয়া লোকের মতো গিয়ে দরজা খুললাম। ডাকলাম—রাজা। রাজা তেমনি উজগ্রামে চিংকার করতে করতে আমার পারের কাছে এল। আমার তেমনি চিংকার করতে করতে বাগানের দিকে চলে গেল। আর কাছে এল না।

তারপর থেকেই রাজার দারুণ পরিবর্তন হল। সে আমাকে আর বিশ্বাস করে না, আমাদের কাউকেই নয়। সবা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাত এবং কারো লাড়া পেলেই নংকিতপদে দ্রুত পালিয়ে যেত। রাজার অবস্থার মধ্যে যেন এক অপরিচিত রাজা ফিরে এসেছে।

এদিকে রাজার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ পর্বতপ্রমাণ হল। ও আমাদের পাশের বাড়ির পাররা ধবেধে নিয়েছে। অল্প বাড়ির বাজা-মুরগীর বাড় মটকে দিয়েছে। আমাদের ডাতের হাড়ি ঠেলে ফেলে দিয়ে সব লওগ্র করে দিয়েছে। গ্রায় গ্রাকান্তে বেরোয়া তাবে অপরাধের পর অপরাধ করেই চলেছে এবং চোখের পলকে কিপ্রগতিতে পালিয়ে যাচ্ছে। বহু চেষ্টা করেও তাকে ধরা গেল না। লাড়ার ছেলেরা ডিল হুঁড়ে একটা চোখ জখম করে দিয়েছে। কে নোড়া হুঁড়ে একটা পা খোঁড়া করে দিয়েছে। কিন্তু তবুও রাজার পরাক্রমের শেষ নেই। চারদিক থেকেই হৈ হৈ আওয়াজ শোনা যায়—রাজা এসেছে, ধর ধর। এই মুহুর্তে পাটিলের ওপরে বেঁচেছিল, পরমুহুর্তেই সে অদৃশ্য। আজকাল তাকে প্রকান্তে গ্রায়ই দেখা যায় না। শুধু গভীর রাত্তিতে আমাদের পুকুরের পাড়ে তার ক্রুদ্ধ চিংকার শোনা যেত—ওঁরাও! ওঁরাও! কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে যেন রাজা সারারাত নাগিল জানাত।

দৈনিক আন্তর্বিজ্ঞানক ভাবে ধরা পড়ে গেল রাজা, আহু বৌদির রাজ্যে
হানা দিতে গিয়ে। বারা ধরতে গেল এমন ভিন্নজনকে কামড়ে আঁচড়ে
দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হল। এবং পরিশেষে পাণ্ডুর
মাতাধিক্য ঘটল। অনেক কোশলে তাকে বস্ত্র-বন্দী করে কেলস পাড়ার
বাস্তামবীর খোকনবা। প্রচণ্ড মারধর করল। রাজার চিংকার শুনে আমি
বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম। মা বললেন—এ আর লজ্জা করা যায় না।

অবশেষে খোকনবা, তার সূটারের পেছনে বিড়ালের বস্ত্রটাকে তুলিয়ে
কোথায় চলে গেলেন। শোনা গেল, তারমহারাধারের ওদিকে কোথায়
হেঁটে দিয়ে এসেছেন।

আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, একে বত দূরেই ছেড়ে আসা হোক না
কেন, আমাদের রাজা আবার ফিরে আসবে। একদিন দু-দিন করে
অনেকদিন কেটে গেল, তবু আসা ছাড়তে পারিনি।

হাড়ে মাঝে গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে যেত, আমি বিড়ানার বসে
কান পেতে থাকতাম অনেকক্ষণ, বাতালে বৃষ্টি বিড়ালের ক্রুদ্ধ চিংকার ভেসে
আসে। কখনও আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে মনে হত, বিড়াল ডাকছে—
ওঁরাও, ওঁরাও, ওঁরাও। আমি লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তাম।
না, কিছু নেই। মনে হত, পুকুরের পাড়ে রাজার কাঠা শোনা যাচ্ছে। কোন
এক অদৃশ্য শক্তি চুষকের মতো আমাকে টেনে নিয়ে যেত, আমি পায়ে পায়ে
ছায়াটাকা পুকুরের পাড়ে চলে যেতাম।

কিন্তু সেখানে কেউ নেই, কিছু নেই। চারদিক ছুড়ে শুধু অন্ধকার।
নিঃসীম অন্ধকার। বাঃ কি কি পোকার ডাক। কখনো কখনো চরক
হাওয়ার গোঙানি। মনে হত, কোন অপরীক্ষী আত্মা যেন নিঃশব্দে কাঁদছে।
ক্রমশ মনে হত যে, একটা অলৌকিক বিড়াল নিঃশব্দ পলচারণার আমাকে
প্রদক্ষিণ করছে। আমার গা ছমছম করত। অথচ আমি ফিরতে পারতাম
না। সেই অনবহীন অন্ধকারে কেবলই ঘুরতে থাকতাম।

ভূমিকালিপির পরিবর্তন

নির্মলেন্দু রক্ষিত

একটু আগেও আকাশের পশ্চিম দিকে সূর্যস্বর সোদর লেগে গিয়েছিল।
গাছের মাথার তখনো ছিল রঙের আভাস।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। সূর্য্যার আবেগ চড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।
এই গাছ-পাছালি আর সবুজ ঘাসের আশেপাশে এখন চাপচাপ বিষণ্ণতা।
পাখিরা কেরার সময় কলবৎ তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন, এই বিস্তীর্ণ নৈঃশব্দে
হঠাৎ অথও নিঃশব্দতার স্বপ্ন।

দিগারেটটা হুঁড়ে ফেলে ঘাসে শুয়ে পড়লাম।

আমাকে কি এখন পরালিত নারক মনে হচ্ছে? কে জানে? হয়ত এই
অলস-নিবিল ভাবিতেই জীবনের সমস্ত ক্রান্তি ছড়িয়ে আছে। হয়ত এখনো
আমার সর্বাঙ্গে অস্ব প্রহরণের দুঃসহ স্মৃতি রয়ে গেছে।

পার্বদ্য থাকলে বলতেন, কম্বুত, এই তো সময়। সব দুর্গ আত্মদেহ
চাই। শুধু লড়াই—অচরিত, অদম্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আসতে পারে
আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি।

আগে এসব কথা শুনেলেই রক্ত ঘেন টগবগ করে মুটে উঠত। ভেতরের
এক অস্থ আক্রোশে দুঁসে উঠতাম হঠাৎ। আমার চোয়াল শক্ত হয়ে যেত।
নিজেই বুঝতাম, আমার বুচোব জলে উঠত নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞায়।

অথচ এখন, এই বিষম সন্ধ্যার, আমি একরূপ ক্রান্তি আর দুঃসহ পরাজয়ের
মানি নিয়ে নিজেই স্বপ্ন লুকিয়ে রেখেছি বৈপাশনে দুর্যোধনের মতো। আমার
আর বুদ্ধ করে কাজ নেই। আমি এখন স্বজন্মে শেত-পতাকা ওড়াতে পারি
বাতাসে। নিবিধার মিছেকে সমর্পণ করতে পারি আমার অস্থ নিয়তির
কাছে।

ভেতরে ভেতরে আমি বোধহয় এই দিমটাকেই ভয় পেয়েছি।

একদিন থাকতে না পেরে বলেছিলাম—মীরা, তুমি শক্তি করে বল—

অভূত মিষ্টি করে হেসেছিল মীরা।

এক সময় বলেছিল—তুমি বোক না?

—বুঝি। কিন্তু মানে—

এবার মীরার হাসি আরো ছড়িয়ে পড়েছিল। ও কিছুক্ষণ চোখের পাতা
কাপিয়ে মুগ্ধবরে বলেছিল—আত্মা!

অনেক চেঁচায় গলাটা পরিষ্কার করে বলেছিলেন—কি আশ্চর্য ?

—ভূমি। তোমার এই রূপ। এমন একজন জলী মেতা—

কথাটা অবশ্য ঠিক। আমি পার্শ্বদ্বার তান হাত। আমি সকলের ঘৃণ-
নেতা। আমি এক ডাকে হাজার পনের ছেলেকে বাইরে বের করতে পারি।
একটা রোগান তুলে এদিককার ট্রাম-বাস বন্ধ করে দিতে পারি। ঘানার
অফিসাররা আমাকে সিগারেট দেয়। পাড়ার অনেক মামী লোক বদলী বা
পলোয়তির ভক্ত আমার খোলাহোদ করে ঘিমা না রেখেই। এখনো অনেক
মনে রেখেছে, এখানকার জনপ্রতিনিধিরা অনেকটাই নিবাচনের আগে আমার
কাঁধে হাত রেখেই বিভিন্ন মহলার প্রচার অভিযানে বেরিয়েছেন।

অবশ্য মীরার কাছাকাছি এলেই আমি যেন কেমন হয়ে বাই। তখন মনেই
হয় না, আমার উগ্র রূপটার কতটাই সবাই আমার সমীহ করে চলে। এট
কয়েকদিন আগেও আমি এখানকার কলেজের ইংরেজী প্রফেসর নিমাই
হালদারের কলার ধরেছি। ব্রিসলিঙ্গ ডট্টর হরিশাধন বসু আমার বাড়ী
এলে চাপে ধরে নিজের চাকরী বাঁচিয়েছেন।

মীর। লব জানে। অবশ্য এমন একটা ভাব করে যেন আমাকে সমীহ করে
চলার কোনো দরকার নেই। যেন ভালবাসাটা আমারই দার।

এর জন্য কিছু করেও যেন কিছুতেই আমি ওর মন পাট মি। গত বছর
এর কটকটাল পরীক্ষার সময় আমি বলেছিলেন—আমি তোমার সঙ্গে করে
নিরে বাব।

ও যেন একটু বিব্রত হয়েছিল। বলেছিল—কি দরকার ? এখন থেকে
এখানে। তাছাড়া ভূমি বাস্তবায়ন।

—বাস্তবায়ন কি আছে ?

—তা মর। আমি তো একাই যেতে পারব।

—আমি কলেজের তেতরে তোমার বলিয়ে দিই অ।
দিক থেকে হুবিধে হবে।

—আমি তো কোনো হুবিধে চাই নে।

একটু ক্লান্ত হয়ে বলেছিলেন—আঃ, লে কথা নয়। ধর হঠাৎ কিছু হলে
গেলে। তখন যদি—

হঠাৎ মীর। হেলে ফেলেছিল। বলেছিল—জামি, ইচ্ছে করলে তখন
ভূমি আমার পাশ পাড়িয়ে ডিক্টেট করতে পার বই দেখে। কিন্তু কথা কি
জানো, কোনো দরকার করে পাশ করে যাওয়ার মতো তৈরী করেছি নিজেকে।

—ঠিক আছে। হোল্‌ নাবারটা নিও। আমাদের পাটির একজন প্রফেসর আছেন টেবুলটার—

—আমার বন্ধু মায়াই তো। বলেছেন নব্বু জেনে দেবেন।

—ধরে কিছুতে যদি সট' থাকে দু-চার নব্বু—

—আমি বার কাছে প্রাইভেটে পড়েছি, তিনিই বলে রেখেছেন—

এখন বুকি; উল্লে করেই যীরা আমার কাছ থেকে কোনো উপকার চায় নি যখন আমি তিলতিল করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছি ওর সত্যার সঙ্গে, ও তখন নিশ্চয়ই মনে মনে আলাদা এক জগৎ তৈরী করে নিয়েছে। আমি বুকিনি, আমি জানতাম না, এই ভ্রম্যনাতে আমার সঙ্গে কেউ এমন বেইমানী করার সাহস পাবে।

পার্থবা একদিন পাটি অফিলে বলেছিলেন—কমরেড, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে।

একটু অবাক হয়ে বলেছিলেন—বলুন।

—উঁহ, এখানে নব্বু। বাইরে চল।

দুজনে কিছুকণ নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটেছি। পার্থবার প্রথম মূপটা দেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারিনি কিছুতেই। অথচ প্রতি মুহূর্তে এক অধীর উত্তেজনার অস্থির হয়ে উঠেছি।

হঠাৎ পার্থবা বলেছিলেন—কমরেড।

চমকে উঠে বলেছিলেন—অ্যা? বলুন, পার্থবা।

—তুমি তো বোক, তোমার ওপর লোকাল লীডারশিপ কতটা ডিপেন্ড করে? বোক তো? হ্যাঁ, কি না বল।

—হ্যাঁ।

—সেন?

—কিছু না বুক চূপ করে হাঁটছিলেন। ক্রমে হাতাঘাট নির্ভয় হয়ে এসেছে। পার্কের একটা বেঞ্চে লামরা এখন বসেছি, চারদিক তখন নিশুন্। বহু দূরে দু-একবার ট্রামের আওয়াজ হয়েছে। কোথাও কোলাপুসিবল্‌ গेट বন্ধ হয়েছে লগ্নয়ে। একটা বাজা যেন কম পেয়ে কিছুকণ কেঁদেছে।

ক্রমে মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। শিরশির শব্দ উঠেছিল মাথার কাছে বাদাম গাছের পাতার পাতার।

পার্থবা হঠাৎ কদ করে বেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়েছিলেন। মুহূর্তের আঙ্গোর বেধে নিয়েছিলেন ওর পৌকব-দীপ্ত মুখটা।

—জরুর।

—বলুন।

—তুমি তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

নাম ধরেই থাকব, কি বল?

—বেশ তো।

খাত্‌ইরু। তুমি আর আমার বিরাট একটা সমান হিলে।

পার্বদা কিছুকণ একটানা সিগারেটের দিকে মন দিলেন। আমি অন্ধকারে একবার ঘড়ি দেখার চেষ্টা করলাম। দুবার চুলে হাত বোলালাম।

—তাপ জরুর, আমরা ওয়েট বেদলে ভাল পোশিশনে আছি, বহুদলগুলোর সঙ্গে লড়াই করতেছি। কিন্তু কথা কি জান, আত্মসম্মতির কোনো স্থান রাজনীতিতে নেই। একদিকে বিরোধী দলের সঙ্গে, অন্য দিকে শত্রিক দলগুলোর সঙ্গে আমাদের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা। সংগঠনকে বাড়াতে হবে। গ্রামে গড়ে, ঘরে ঘরে। প্রতিটি সংসারে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কোনো ভগ্নট ভেঙে দেওয়া চলবে না—তাই বলছিলাম—

—বলুন, পার্বদা।

—বলছিলাম কি, এই সংগ্রামে আমি তোমার ওপর—তোমাকে—

—বলুন।

—বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে পাঠাতে চাই।

কলকাতা জেলেস করলাম কোথায়? কলকাতার বাইরে?

শোনা হয়ে বলেছিলেন পার্বদা। বলেছিলেন—অতীথে আছে?

—না, মানে—ঠিক তা নয়—বহি কলকাতাতেই—একটুখানি অবত—

—আমি জানতাম; তুমি যেতে চাইবে না।

—ঠিক সেটা নয়, পার্বদা। মানে—

পার্বদা সিগারেটের টুকরোটো ছুঁড়ে ফেলে থেমে থেমে জিজ্ঞেস করেছিলেন—মেয়েটির নাম মীরা?

—আজ্ঞা?

—জরুর, তুমি কোথায় উঠতে পারতে, কিন্তু সামান্য একটা—

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তপস্বরে বলেছিলেন—পার্বদা—

—শোন জরুর, তুমি পার্টির অন্য সময় দিতে পারছ না আজকাল। মিটিং-এ যাও না, ক্লাস করো না। সেই চটকলের ট্রাইকের দিন তুমি নেই—তাকে

নিঃে চলে গেলে খোঁটানিকলে—অথচ বলেছিলে, তোমার মাঝার অস্থ, দিরাটিতে তে'মাকে—

আপনি আজকাল আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করছেন। জানবেন পার্থনা—

—কী ইতি, অস্থ! অস্থ কিছু নয়, তোমার ভালবাসি, নিঃর করি, দেশের তুমি একটা আলেট্ হতে পারতে—

আমি জানি আমি কি হতে পারতাম। কিন্তু এক এক সময় সেট লোভ আমার উদ্দাদ করে তুলত। নেতৃত্বের মোহ আমার দীর্ঘ কয়েক বছর জুত-গ্রহের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, আক সেটা স্বীকার করি। কিন্তু গত দু-বছরে আমি কেমন করে যে বলে গেছি, নিঃেই জানতাম না। মীটার শান্ত জুটো চোপের দিকে তাকালেই মনে হত লংঘ-লংগ্রামের, নেতৃত্ব আর দলাদলির জীবন আমার নয়। আমি এক ক্রান্ত পথিক, অনেক তুং-রাতের পথ পেরিয়ে আমি যেন একটু শান্তির স্বাদ পেয়েছি, খুঁজে পেয়েছি এক নির্ভর আলয়।

মা কি খুঁজেছিল, কে জানে।

একদিন বলেছিল, শোন আমার মনে হয়, তুই রাতে একটুও ঘুমো না।

চমকে উঠে বলেছিলাম কই, নাভো।

—কখন ঢুকিস? কে যে তোকে দরজা খুলে দেয়—এতে ঘুম হয় নাকি? মনে হয়, তোমার কি যেন হয়েছে কিছুদিন থেকে—কি যেন ভাবিল—কি আশ্চর্য।

হেসে ফেলেছিলাম।

রাগাবর থেকে বৌদি বলেছিল—এবার বিয়ে দিয়ে লংসারী করুন মা।

খবরের কাগজে চোখ রেখেই বাবা ফোড়ং কেটেছিলেন—লংসার করবে এরা? তাহলে দেশোদ্ধার করবে কে? পথশতা, জনশতা—লব কীল হয়ে যাবে না?

তাড়াতাড়ি চারের কাপ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

বৌদি বেরিয়ে এসে বলেছিল—আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমাদের সেইলব দাদাটা তো বয়-লংসার করছেন? না কি তাঁরাও তোমাদের মতো—

চটিজোড়া পায়ে গলিয়েছিলাম তন্দুনি।

বৌদি হাসিমুখে বলেছিল—ইন্কিলাব।

বাবা বলেছিলেন—বাস, সূর্যের বাঁড় বেয়েল।

সোভা মীরাদের বাড়ি গিয়ে ওর খাটে ধুপ করে বসে পড়েছিলাম।

মীরা এগিয়ে এসে বলেছিল—কি হল?

—সবাই মিলে আক্রমণ করেছে।

—ক'য়? তোমাকে?

—পলিটিক্যাল নয়। ভৌগোলিক। বিষে করতে বলছে।

—ক'র না।

—কাকে করব?

—এদেশে যেসবের অভাব? একবার শুধু খোষণাটা করে দাও।

লাইন দিয়ে—

—মীরা।

—উঁ।

—সীরিয়ান হও। কি করবে বল। এতদিন হল—

—কিলের?

—কিলের, তুমি জান না? আমাদের ব্যাপারটা। অবশ্য পাটির হোল টাইম ওরাকার বলে চাকরী করতে পারছি না। কিন্তু ভাবছি, সব ছেড়ে এবার—

—বেশ তো।

—কি বুল করেছি! ইউনিয়ন করতে গিয়ে গড়গোলে লালপেও হলাম কলেজ থেকে—পলিটিক্যাল সেজ হল, পালালাম এখান থেকে। তখন যদি ভ্রলোকের মতো লেখাপড়া নিয়ে—

স্বপ্নর করে হেলেছিল মীরা। ওর গালে নরম একটা টোল পড়েছিল তখন।

—মীরা, আমি প্রাইভেটে বসব। তুমি হের করবে?

—সিওর।

—আমাকে তুমি নিজের মনের মতো করে নাও মীরা। আমি সবকিছু চাঙতে পারব। তুমি যা বলবে, যেভাবে চালাবে—

মীরা আঘাত চূলে বিলি কেটে দিয়েছিল। ওর শরীরের শিথল স্বরভিত্তে দুবিধে দিয়েছিল আমার সমস্ত অস্তিত্ব।

প্রাইভেট কার্গে চাকরিটা নিতেই অনেকে স্ক্রম হয়েছিল অবশ্য।

নিভাই বিরক্ত হয়ে বলেছিল—করুণ, এটা তুই কি করলি, বুঝলি না।
একটা মেয়ের করুণ সব ছাড়লি? ক্লাসে' বাস না, মিটিং-এ থাকলি না।
সেদিন বিধানসভা থেকে বেঁচেই মানিকদা এলেন, অথচ—

—আমার ভাল লাগেনা রে।

—মীরা তাকে—

—মীরা, নিভাই ঠপ্ ঠপ্।

—তোকে একটা বিরাট দায়িত্ব দিয়ে পার্বদা—

—জাং ইয়ের পার্বদা।

নিভাই কিছুকণ অবাক হয়ে দেখেছিল আমার।

বলেছিল—তুই বললি কি?

—ও আমাকে বাগড়া দেয়? শালা নিজেকে এক বিবাহিতা মহিলাকে
ভাগিয়ে আনে মি? ওর আগের বৌ তার একটা বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি
থাকে, একটা প্রাইমারীতে পড়িয়ে কোনোভাবে টিকে আছে, আমি জানি না?

—করুণ।

—ইয়েস, আই নো ইউ। আমার চোখ ঝাঙাল না। আমার কানের
দায়িত্ব দিয়ে বাটারে পাঠায়, কেন নিজের ডাই তো উঠতি নেতা, কেন ও
যাবে না? ও গেলে শিউলীর সঙ্গে মাঠে-মরদান্দে প্রেম করবে কে, ডাই না?

নিভাই কিছুকণ আমাকে দেখেছিল।

হঠাৎ বলেছিল—তোমার অবস্থা বুঝতে পেরেছি। ইউ আর লাই। কিন্তু
তাও যদি মেয়েটা ভাল হত। দিলীপ বলে একটা এজিনিয়ার ছোকরা—

—কি? কি বললি তুই? আর একবার বল।

—মেজাজ খেপাল না। খোঁজ নে আগে।

হন হন করে নিভাই চলে গিয়েছিল।

আর আমি? আমি সেট থেকে এক অস্থির বয়সের নিজেকে শেষ
করেছি। বারবার মনে হয়েছে, আমি কি তবে হেরে গেছি? যে তরুণ আমি
প্রতি মুহূর্তেই করে গেছি, সেটাই কি সত্যি? মীরা কি অন্তরের অন্তহীন
ঘণাকে জিইয়ে রেখে বাইরের অভিনয়ে আমার মন ভুলিয়েছে এতকাল?

আমি একটা এলাকা বন্ধ করে দিতে পারি। অচল করে দিতে পারি
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আমি প্রফেসরের কলার ধরতে পারি, প্রিন্সিপালকে
ডাড়াতে পারি, পুলিশ-অফিসারদের মক্কেলে পাঠাতে পারি। কিন্তু একটা
সামান্য মেয়েই যদি আমাকে ভাল না বাসে, আমি কোর করে তার ভেতরে

অত্যাশঙ্কিত কবতে পারি না কিছুতেই। আমার কন্মতা-অকন্মতা তুটোই আমি আমি ভাল কর।

একটা অবাধ বরণা মিরে আবার কোড়েছি মীরাবের বাড়ি।

ওকে বুকের কাছে টেনে মিরে বলেছি—মীরা, মীরা—

—কি হয়েছে তোমার ?

—তুমি—তুমি আমার—

—কি হয়েছে, বল না।

—আজ্ঞা, মীলিপ নামে বে ছেলেটা আছে—

—ও, এট কথ্য ? তুমি তো জান, ও আমারের মাঝতো দাশ। আশ্চর্য্য, তুমি কি আমার—

—না, মীরা, বিশ্বাস কর, লক্ষী মেয়ে। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়—

—তুমি একবারে বোকা।

—হঠাৎ মাথার ভেতরে কি বেন হতে গেছিল।

বিকৃত রূপ গলায় বলেছিলেন—কিন্তু মীরা, যদি সে একম কিছু হয়, আমি ছাড়ব না। ওকে আমি এক তুড়িতে হাসিল করে ফেলতে পারি। লাংড়া-ভাতকে একবার বললেট—

চোখ বড় বড় করে মীরা বলেছিল—এট ভুল সবাই তোমার ভয় পায়।

তখন আমি আবার সখিৎ ফিরে গেয়েছি।

কাতরভাবে ওর তৃহাত ধরে বলেছি—মীরা, আমি চাই না কেউ আমার ভয় পাক। আমি শুধু একটু ভালবাসা চাই—তোমার কাছে আমি—

—পেরেচ তো।

কি পেরেছিলাম আমি না।

অকস্মে অস্তিতাররা আসায় এক সপ্তাহ ভীষণ বাস্ত ছিলাম।

আজই একটু হুযোগ পেয়ে একটা পোকরাগ বদানো আঙটি কিনে ওদের বাড়ি গেছি। কলিং বেলটা টিপে ভাবছিলাম পাখরটা মীরায় ফর্গা লক আঙলে কেমন দেখাবে।

দরজা খুলে অপরিসিদ্ধা মহিলাটি অবাধ হয়ে কিছুক্ষণ দেখেছেন।

—মীরা নেই ?

—ওরা তো বাড়ি বিক্রী করে দিয়েছে। আমার পরশু এখানে এসেছি।

—কোথায় গেছে জানেন ?

—তাতো জানি না। মেয়েটার মিরে জনলায়, এক এগ্রিনিয়ার ছেলের

লগে। খড়গপুর কোথায় যেমন ওদের দিদির বাড়িতে বিয়ে হবে
তুনেছিলাম।

কেনন করে যে সিঁড়ি ফেটে নেমে এসেছি, এখন বলতে পারব না।

সাত এখন কত কে জানে। যেবে যেবে আকাশ ঢেকে গেছে। হাওয়া
ছাড়ছে মাঝে মাঝে। প্রকৃতি কি উদ্ভাষ হয়ে বাবে কিছুকণের মধ্যে? এক
মহা-প্রলয়ে কি ধ্বংস হয়ে বাবে সমস্ত সৃষ্টি?

—ক'টা বাজে?

চমকে উঠলাম। একটা স্বেণা মেয়ে এলে পাড়িয়েছে।

খড়ি দেখে বললাম আটটা পর্যন্ত।

কিছুকণ ও পাড়াল। শেষে, এক পা বাড়িয়ে বলল—বসব?

উঠে বসলাম। হেসে বললাম—লাইনে বেধে পড়েছে?

—যেহেটা কয়েক মুহূর্ত চূপ করে রইল। শেষে মাথা নত করে বৃহস্পতি
বলল—বাবা অম্ব, কেউ বড় নেই দেখবার মতো। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে—
আঙটিটা বের করে দিয়ে বললাম নাও, এতে তোমার কয়েকদিন—

—না।

--কি হয়েছে?

—বার গুণ তৈরী করিয়েছেন—

—একই কথা। বরং তোমার কাজে লাগবে। ধর, আমি খুশী হব।

একটু ইতস্ততঃ করে মেয়েটা প্যাকেটটা নিল। একটু দূরের পাছ-পাহালির
রহস্যময় অন্ধকারটা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল—চলুন না, ওখানে বলি।

—আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।

—কাল এই সময়ে এখানে আসব? থাকবেন তো?

—হ্যাঁ।

আবার আমি গুয়ে পড়েছি। এবার বৃষ্টি নামবে। ঈতল ধারায় স্রিষ্ট
হয়ে উঠবে সমস্ত পৃথিবী। নিটোল শাবিতে চারদিক ভরে বাবে আবাস।

আগামী কালের অন্ন আমি নতুন করে বেঁচে উঠব।

সম্রাট দেবপ্রসাদ মিত্র

বরোজা ঠেলে ওদের ট্রাটে ঢুকতেই বেঁধি বাথকমের কাছে সত্তর চিৎ হয়ে পড়ে আছে, একটা হাত বেকারকার নিষ্ঠের তলার পড়ে হুমড়ে গেছে। ডাড়াডাড়া কান্ডে গিয়ে একে ঠিকঠাক করি। ওর জ্ঞান ছিলনা, ঘরে ঢুকে বেখলাম মারিও নেই। সত্তরের বুড়ী মালী মালা জল করছিলেন। তাঁকে সব বলতেই হাঁউমাঁউ করে ওঠেন তিনি। দুজনে বরাধরি করে শুইয়ে দিলাম সত্তরকে ওর খাটে, রাত্রি-সত্তরের আট বাসের মেয়ে মিষ্টি পানেশট। মালী বকবক করতে থাকেন—“বত বলি একটু সাবধানে থাক্, এখনো অস্থব তোর ভাল করে দায়েনি...তা বাছা কে শোনে কায় কথা।”

সামান্য দেবা বড়ুই হুহু হয়ে উঠলো সত্তর। লজ্জার পড়ে বেচোরা আমাকে বেবে, কৈফিয়তের কণ্ঠে বলে “মাথাটা কেমন ঘেন ঘুরে গেল বাথকম থেকে বেরিয়েই”। ওর পাভামাটা ছিঁড়ে গেছে অনেকটা। “রাত্রিরও হয়েছে এক জালা, আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে ও.....মালী তুমি বরং ক'জুকে বলো নংকরবাবুকে চা করে দিক”—বাত হয়ে উঠলো সত্তর।

“বাহা থাক না এত তড়া কিসের, রা ত্র আহুক না, আমি বললাম।

সন্ধ্যায় রাত্রি এলো, সব শুনে হাকপ বাত হয়ে উঠলো, আপদিত হয়ে সত্তরের কাছে গিয়ে ওর মাথার হাত বুলিয়ে দিল, “আচ্ছা তুমি এমন ছেলে-মাহুবি করো কেন বলতো—একটা আমি কতদিক সামলাবো?” রাত্রি অভিযোগ করে। সত্তরের হু চোঁট আলো করে জলে উঠলো প্রশান্ত হাসি। উদ্বিগ্ন রাত্রি ডাক্তারের লখা প্রেসক্লপসান দেপতে দেপতে ঢকল হয়ে উঠলো।

রাত্রির উবেগ আমাকে স্মৃতিচরী করে তুললো। মনে পড়লো অনেক আগের বিকেলগুলোর কথা। তখন সারা দুপুর আমার চাকরী জোগাড় করার ব্যর্থতা স্মৃতিচিহ্ন একে বিত্ত পরীর, মন জুড়ে আর রাত্রির উবেগ, ভালবাসা প্রলেপের মত করে পড়তো সারা বিকেল বেলা। রাত্রি তার ভালবাসা ছড়িয়ে বিত্ত অক্লপন সম্রাজীর উদারবার, আমি ডিখারী বালকের মত হু হাত ভরে নিতাম ঐশ্বর্যে। রেজোটার নীলপর্দা বেড়া নির্জনতার হু কাণ চা শেষ হয়ে বাবার অনেক পরেও আরহা বলে থাকতাম। রাত্রির হু চোখে দেখতে পেতাম আজকে পড়া সত্তরের নীলাভ চেঁ।

হাত বাড়িতে সময় দেখলো রাত্রি, "সড়ে আটটার মধ্যেই সব কোকান টোকান বন্ধ হয়ে বাবে, চলো না শংকর আমার সঙ্গে একটু"—ব্যস্ত হয়ে উঠলো ও। সত্তর মৃত্ত আপত্তি জানালো—"শংকরবাবু না হয় চা টা খেয়েই যাবেন"।

"ফিরে এসে চা খাওয়াই ভাল কি বল?"—রাত্রি আমার দিকে চাইল, তারপর সাবধান করলো সতরকে—"সাবধানে খেচো, ঘোঁরাই তোমার, ওখুড়লো কিনে আমরা বটখানেকের মধ্যেই ফিরবো।"

লম্বুক এক পরীর মত হেঁটে চললো রাত্রি। আমি তাকে অহুসরণ করলাম। আমার বকের ভেতর ডুবুরি নামে আবার, হাতড়ে খুঁজে আনে হীরে মানিকের মত হারানো দ্বিমের লুক্কর। গোবিন্দপুর সেকেন্ডারী স্কুলে বাটারি শেষেছিলাম শেষ পর্যন্ত অনেক বোরাবুরির পর। শহরতলীর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে দূরে, গোবিন্দপুরের কাশের গুলে, নীল আকাশের অব্যাহত প্রচ্ছন্নতার, জ্বলন্ত শব্দের মাঠে আমি আমার স্বপ্ন রেখেছিলাম। বাবলা গাছের হলুদ ফুলের ড্রাগ নিয়ে আমি দীর্ঘ পথ হেঁটে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—গোবিন্দপুরেই গড়ে তুলবো স্বপ্নের রাজ্যপাট, শহর কলকাতার রাত্রি হবে সে রাজ্যের ঈশ্বরী।

আমার সাধ্য ছিল সামান্য, তবু রাত্রিকে ডেকেছিলাম। রাত্রির বাবা আপত্তি জানালেন, বিন্মিত হলেন সামান্য আগের শিক্ষকের ঔষভ্যে। এক লক্ষ্যায় রাত্রি আকুল হল চুচোখের ধস্তার। প্রতাপতি মার্কো নিম্নশলিপি ছাপানো অক্ষর ঝাপসা হয়ে গেল, ঝাপসা হয়ে গেল কৃত্তী ইন্ডোমীয়ার সত্তর দানবন্তের সঙ্গে রাত্রি সেনের শুভপরিণয়ের ঘোষণা পড়। তুমি কি কিছুই করতে পারো না? রাত্রি প্রশ্ন করেছিল। আমি কি কিছুই করতে পারি নি। শুধু আবেগের হাতিয়ারে এক দৃঢ় দুর্গের সামনে রণসজ্জা মানায় না। কাপুকবের মত আমি আজির মিরেছিলাম গোবিন্দপুরের অরণ্য-নিবাসনে। আমার সারা পথ জুড়ে তখন ছড়ানো বাবলা গাছের বিবাক কাঁটা।

একটু বেগী হয়েছিল তবু আমি সব যেনে নিলাম অতি লহক গল্পের স্বাভাবিক পরিণতির মত। ক্রমে আমার হৃৎ, তারি, রাত্রি, দিন আবার স্মরণ হয়ে উঠলো অল্প এক অহুত্বিতে। আমি তো পেয়েছি রাত্রির রূপ বহন করা অসুত! মিরেছি আমার নিবাস ভালবাসা। রাত্রির বিবাহ-অল্প বা একমাত্র আমারই, আমাকে সস্ত্রাটের মত সম্পন্ন করে তুললো। সত্তর দানবন্তের আঘাতে ভেঙে পড়া পৌষের আগ্নেয় পানে আমি গড়ে তুলি গৈরিক উত্তান, শ্রমানের পুত্ততার খুঁজে পেলাম শকবটীর ছায়া।

গোবিন্দপুরেই রাত্রির প্রথম চিঠি পেলাম, দীর্ঘ সে চিঠির প্রতি ছেঁে দৃষ্টির তাৎকালিক। তার পরের চিঠিগুলো ছিল বড় সংকীর্ণ, তবু তাদের পুত্র সংশে আমি হেগতাম অলৌকিক অক্ষর—“তোমার ভালবেসে আমি বড় ডঃবী হে, শংকর !”

এক পূজোর ছুটিতে কলকাতার বেধা হয়ে গেল রাত্রির সঙ্গে। আগের চেয়ে অনেক ফর্দী হয়েছে ও লৌকিকও বেড়েছে। আমার সঙ্গে সন্তের আলাপ করিয়ে দিল রাত্রি। ছুট লম্বা বাতাবান সন্তের সৌভক্তে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওর পাশে আমার পাচ দুট পাচ ইকির নাতিরক অতিথ বেন জান হয়ে বাক্সিল। তবু নিজেই আমার বড় স্থনী মনে হয়েছিল, মনে হচ্ছিল রাত্রির সান্ত্বনা সে তো আমার করায়ত্ত। রাত্রির চোখ বেধে মনে হয়েছিল দেখানে নীরব বেধনার নদী বয়ে চলেছে। ককি তৈরী করছিল রাত্রি। তার ছুটির সঙ্গে বেন হুঃখ বেজে-উঠছিল চীনেমাটির পেয়লা-পিয়ীচে, জলতরলে বেন হুঃ করে কেউ কেহে হাচ্ছিল—“আমি হুঃখী, বড় ডঃবী হে”—। আমি বুকতরা স্থ নিরে গোবিন্দপুর গ্রামে ফিরেছিলাম।

“একটু ভাড়াভাড়া হাটোনা দীর্ঘ”—আমার উদ্দেশে কথাগুলো ছুঁড়ে ফুৎগতি ফেরিংগোর মত হেটে যায় রাত্রি। ওর সঙ্গে হেটে েরে উঠি না আমি। ফলওহালার কাছে থামে রাত্রি, কিছু নথর আপেল কেনে। আমি মনে মনে লজ্জিত হলাম, অসুস্ত: একটা আপেলও তো আমি নিরে যেতে পারতাম সন্তের জন্ত। সন্ত দাক্ষ ইনসুপেরতা থেকে সুবেমাজ রেগাই পেয়েছে। সংকীর্ণতার চিঠিতে রাত্রি আমাকে এটুকুই জানিয়েছিল। স্বাভাবিক সৌভক্তে আমি সন্তকে দেখতে এসেছিলাম।

“রাত্রি, পোনো” আমি ডাকলাম, ফিরে তাকালো ও। ওর চোখে মুখে অনেক আপংকা। হরতো উপস্থাপি রাত কাগার রাত্রি। আমি আমার বস্তবা হারিয়ে ফেললাম, বললাম—“তুমি মিছেই তর পাচ্ছো রাত্রি, সন্ত ভাল হয়ে উঠেছে।” জানিনা রাত্রি আশত হল কিনা, ব্যাভাভা চোখ তুলে বললো, “অস্থ বিস্থ সইতে পারে না ও মোটেই, একেবারে ছেলেমানুষ, মিটির মতই, এতো অসহায়, আমি না থাকলে কি হে করবে...। জানো শংকর ও কি রকম লোক”—মুহু হাললো রাত্রি, তারপর দীর্ঘ পথ আমি শুনলাম এক রূপ-কথার গদ্য। সন্ত নামে এক রাজপুত্র আর রাত্রি নামে এক রাজকন্তা। বৌবন পকীরাজে উড়ে বেড়ায় সে গড়ে—কখনো কৃত্তবমিনারে, কখনো

হাউস্ট আবৃত্তে কখনো বা পুণিবার তাকমচলে কিংবা প্রচণ্ড শীতে কান্দীর উপত্যকার নিবিড়তর সারিধো। আমি হাতেরে বাই জমশঃ, রাত্রি বলে, "ও আমাকে ছেড়ে একটুও পাকতে পারে না।" বেহুতো সেতারের মত আমি একবার বলে উঠলাম—"রাত্রি, অনেক আগের দিনগুলোর কথা তোমার মনে পড়ে? যখন আমরা নির্ভরতা খুঁজে বেড়ালাম কলকাতার ভীড়ে!"

রাত্রি হাসলো—"কি ছেলেমানুষি না ছিলাম আমরা সেদিন, বড় বেনী সেটিমেন্টাল ছিলাম আমি।" রাত্রির কথা শুনে আমি চমকে উঠি, বলি, "আমি কিন্তু এখনো তেমনটি আছি।" রাত্রির কোন ভাবস্বর ঘটে না, বুকেতে পারি রাত্রি এখন সেদিনের সব ছেলেমানুষী তুলে সাবাধিকা হয়ে উঠেছে, ভাগিনস সেদিন এক ফুলমাটিরের সঙ্গে নিজের ভাগা ভড়িরে ফেলেনি। "রাত্রি তুমি বুদ্ধিমত্তী লব ঠিকঠাক বুকেতে পারো" আমি বলে ফেলি। "তাই না কি," ও হাসে, বলে "জানো আমাদের সে দিনগুলোর পছ করে আমি আর সত্তর এখন হাসাবাসি করি, ও বলে তোমার লংকরবাবু না একটা..." "থাক," বাবা দিলাম আমি, আমার লকিত তুমুল্লা চর এভাবে ঝাঁচের মূল্যে ছড়িয়ে বাবে আমি ভাবতেও পারিনি কোন দিন। বলতে ইচ্ছে হল, রাত্রি তুমি সত্তর ছাড়া আর কি কিছুই জানো না এখন, আমার সঙ্গেও তো তোমার অনেক দিন দেখা হয় নি, তোমার কি জানতে ইচ্ছা হয় না কিভাবে আমি এখন দিন কাটাছি। একটা টেননারি দোকানে ঢুকল রাত্রি, নামী চকোলেট কিনল এক প্যাকেট। আমি একটু বিস্মিত হলাম, তবে কি আগের মত আমার টোয়ের ফাকে চকোলেট গুলে দেবে রাত্রি। "এই রাখত এটা তোমার পকেটে, সত্তরের খুব ফেডারিট, খেয়ে কৈলনা বৈন আখার, তুমি বা পেটুক"—রাত্রির কঠোর হালার ওরটি বিদ্রোহের মত আমাকে ধাক্কা মারল।

ওখুধে, ফলে, রাত্রির হাত ভরে গেছে। শুকবোচিত সৌভাগ্যে আমি ওর কঠোর অংশ নিতে চাই। রাত্রিও লখকিছু তুলে দিল আমার হাতে। দুঃসহ বোকা নিয়ে আমি চললাম রাত্রির পিছনে। আরও ফল কিনলো রাত্রি। এমন সুযোগ হরতো আমি আর কোনদিন পাবো না—রাত্রির কঠো লাববের ওর বাখার অনীদার হবার আমি হাত বাড়িয়ে ফলভরা প্রাণিকের মুড়ি দিলাম রাত্রির হাত থেকে।

রাজেন্দ্রানীর মত রাত্রি চলে। পিছনে নতুনখে আমি চলি, ওখুধ, ফলের ভায়ে বড় বেনী রকম বিনীত হয়ে। আমার চোখের সামনে তেলে উঠলো সত্তরের সুখ। বড় ছবল, অল্পখ তবু সঙ্গারগা পৃথিবীর একমাত্র অদীশ্বর সে

এক সন্ধ্যাট, বার সাপাহত দুৎকারে আমার বপ্তের বাড়ীঘর নিঃশেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বহুদিন আগেই—আমার অজান্তে।

ঠা ঠা করে উঠলো সন্ধ্যা—“কি আকল তোমার রাত্রি, লংকরবাবুকে দিয়ে সব বটরে নিলে!”

রাত্রি কোন কথা বললো না। ধমারিত চাহের পেরালা নিয়ে সন্ধ্যা অনেকক্ষণ গল্প করলো আমার সঙ্গে। “ভাবছি একটু শুছিরে নিয়ে আমরা কটিনেট টায়ে বেরবো, ও বললো, রাত্রি গভীর হয়ে থাকলো।

চলে যাবার সময় রাত্রি আমাকে এগিরে দিতে এল। “আবার কবে আসবে?” ও বিজ্ঞাসা করলো, জানি না, হয়তো আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না, আমি বললাম। হঠাৎ রাত্রি আমাকে প্রর করলো—“আচ্ছা আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয় আমি খুব আনন্দে আছি?” “কেন তোমরা তো বেশ খুঁই হুশিয়ারি,” আমি বলি, “বেশ হাসাহাসিও করো আজকাল অতীত নিয়ে”।

করুণ হাসলো রাত্রি, বললো, “তোমাকে বা বলছি তার সবটাই সত্যি না হলেও আমার উদ্বেগ কিছু সফল হয়েছে।”

“মানে? তোমার কি উদ্বেগ সফল হল?” আমি অবাক হলাম। “দেখলাম তুমিও সন্ধ্যার মত, ও একদম লুপ্ত করতে পারে না তোমার কথা—আর আমি...আমার অবস্থাটা যদি কাউকে বোঝাতে পারতাম...” হঠাৎ চুপ করলো রাত্রি। আমি অনেক প্রর করতে চাইলাম...রাত্রি শুধু বললো, “এবার তবে বাই, চিঠি লেখার অনেক অহুবিধা, এভাবে হঠাৎ যদি একদিন আবার দেখা হয় তবে”—

তারপর রাত্রি আমাকে অবাক করে আমার ঠোঁটে তুলে দিল সেই দামী চকোলেট, হাতের মুঠোয় ছিল ওর, আমি দেখতেই পাচ্ছি নি। আমি রাত্রির চোখের দিকে তাকলাম—দেখলাম সেখানে এক নীরব বেদনার নদী অনেক নীল ঢেউয়ে ভেঙে পড়তে চায় বাসুচরের বুকে!

গ্রন্থ-আলোচনা

কাজিকত বর্গ। ঈশ্বর ত্রিপাঠী। বামুড়া। দাম : তিন টাকা।

বসন্তে নাড়ী বদল। দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাচী
প্রতীচী, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-২। দাম : ৩.০০।

বেলা ও সমুদ্র। স্বজ্ঞাতা প্রিয়ংবদা। প্রকাশিকা, অভিজাত
পুস্তক প্রতিষ্ঠান, পানবাজার, গোহাটী। মূল্য : ভারতে ৬ টাকা।
বিদেশে ২.৫০ ডলার।

নিবিচার ব্যক্তিগত রসজ্ঞানের প্রমাণপত্র যদি পেন করা যেত—তাহলে
উত্তর-সত্তর দশকের কবিমূল আমার প্রিয়জন। যাটের দশকের কবিতায়
যে হতাশা, ক্রান্তি, অবসাদ, রাজনৈতিক পরিভাবার ছবিতো বা অবক্ষয়—তা
সত্তর দশকের গোড়াকার ছ'এক বছর পর্যন্ত ধাক্কা করেছিল। কিন্তু উত্তর
সত্তরে কবিতা আবিষ্কার করলেন—জীবনকে ভালবাসার নাম কবিতা। শুধু
কি ভালবাসা—এক বছরে কবিতা বিবাসে—সম্পূর্ণ প্রহীণের মতো উজ্জল
হয়ে উঠল। আমারও কবিতার মধ্যে জীবনকে ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস
ফেললাম। যথার্থ মহৎ কাব্য পাঠের ফলশ্রুতি নিঃসংশয় দার্শনিকের
উপনিষদের স্বস্তি বচনে আস্তি। "It is the solace of my life, and it
will be the solace after my death."

১। 'কাজিকত বর্গের' লব্ধ ঈশ্বর ত্রিপাঠীর বেদনা তির্যক্ বচনে আত্মবিস্ত।
'অগ্রজের অটল বিশ্বাসে' অথবা প্রকৃতির ধ্যান সমাহিত ভাবসামুদ্রা ও বর্গ-
লাভ সহজ—সরল প্রত্যয়ে অবিনাশী ছিল। কিন্তু আধুনিক জীবন-যন্ত্রণার
সে আকাক্ষ্য মেটে কই? "নদীর সত্ত্ব তুকা মেটার সমুদ্র মেঘ, আমাদের
কারো নেই সে রকম সম্পদ খামার, অথবা প্রাচীন যন্ত্র—আমি ভুগ্ন, যে
প্রকৃতি, তুমি সব হও।" "পুন্ডিত লোকের বেবে সমূল বুককে বয়ে তোলা"

দুঃস্থ বলেই কি কবিমনের যত্নে। দুঃসহতঃ ? বচ কবিতায় এই ইঙ্গিত স্বর্ণ-
লাভের বাঞ্ছার কবিত্বের দোলচল বুঝি। অন্য কবিতায় তাই সৰ্ব্ব হতে
শুনি—“কল ভেদে হাঁটু মল, অবশ্য কটি ডুবুডুবু—হস্তো। তক্ষণ দূর তোরণ-
মালার মত পরাজানে যত্ন, চোরা খাদ।” ঈশ্বর ত্রিণীতির কবিতায় নক্তি
চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাব স্পষ্টোচ্চাশ্রিত। অবশ্য, সত্তর দশকের কোন কবির নক
নক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাক্যরীতি এড়িয়ে গিয়ে কাব্য-প্রয়াস দুঃসাধ্য। কিন্তু
এটা প্রত্যেক কাব্য প্রয়াসের স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য—কবির রূপ-রসগত তার
কাব্যগত থেকে অভিন্ন। বর্তমানে, স্থিতিশীল নক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাটের
দশকে বা সত্তরের দশকের গোড়ার রচিত উচ্চাঙ্গের কবিতাগুলিতে ঐক্য ১
বা কলিঙ্গের মিলন সর্বসম। তাই কবি যখন লেখেন, “ভাতল তবির বৃদ্ধা
কদিন সময় লাগল, কই চোরের উপর তুমি বাটপাড়ি লিখে নিলে, অজ্ঞেও
খই—কখনে মেলাতে হয় হিতকারী টোপ গঁথে যেছুড়ে খেলানো—তিন লাখ
প্রায় শটকে ধীর হির উঠে আসা নয়ন ভোলানো।” (২০নং কবিতা)—তখন
এই কবিতা হবে যেন ধরা দিতে চায় না।

অবশ্য একজন সংগীতি কবির লক্ষণ ঈশ্বর ত্রিণীতির কবিতায় আছে।
কবির ইঞ্জিয়-সচেতনতা ধরণীর রূপ গদ্য স্পর্শে সহজেই স্পর্শকাতর হয়ে
উঠেছে। “জন্মের দুঁজে বেড়াচ্ছে লাল গোলাপ তাই গুণগুণ ধ্বনি।” আর,
বহুদিন বাদে ভালো গতি কবিতায় আবার পাওয়া গেল ঈশ্বর ত্রিণীতির
কাব্যে। “নয় আমার লক্ষ বলে বাড়ালে দুই হাত—ধলেশ্বরী পাড় ডাকল
লক্ষ ছলাং ছলাং—আগাছা বত উজাড় করে বঠলে ফুলফুল—তোমার পাখে
তোমারি ফুঁ—তুমিই দিলে উলু”। (৪৪নং) নিখিয়ার ঘোষণা করা যায়—
সত্তরের দশকের কাব্যমালার মধ্যে স্মরণীয় নক্তি বলে এগুলি উদ্ধৃত করা
যেতে পারে। উল্লেখ করতে লোভ ভাগে ১৩ সংখ্যক কবিতা। “কতক ছিল
আবেগ জানা, কতক পুরো অঁধার—কারির কলে আপন হাতের লঙ্কাকানো
চারা—নির্জনতা ছিল না সবী হঠাৎ গলাগলি—কোন দিকে কোন হাবল কে
বে বাজার গুল গুল।” পূর্বেই উল্লেখ করেছি—ঈশ্বর ত্রিণীতির কাব্যে একজন
শ্রেষ্ঠ সং কবির লক্ষণ আছে। কণ্ঠ আঙ্গিক বা রূপকল্পের মায়া থেকে কবি
নিজেকে মুক্ত করতে পারলে—তার কাছে পাঠকের যে আকাশ ছোঁয়া
প্রাণাশা—তা তিনি পূরণ করতে পারবেন। অন্য কবিতাটি এরকম এক কষ্ট

কল্পিত গোলকধাঁধার উদ্ভাটন। অথচ, কবির ইচ্ছা কল্পনা যেখানে প্রত্যয় বাহিত—তা ধারাল ছুরি। আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে। যেমন—
 “তখনো ফলফল রাতি লগ্ন পাটভাড়া” অথবা, “শর বন দেখেনি সে, নিপাট বস্ত্রতা। ছোট্ট মূনিয়ার মত তারো সমর্পণ ছিল বড় অপহরণ।” গজাঙ্গলে গজাপূজার মত কবির বচনে কবিকে স্মরণ করাই—“দে খেলার সেই জানে নিছক তোমার লজ্জা অহুকার্য শব্দগুলি কেমন জোরালো।” তাই কবির হৃদে হৃদ মেলাই—“আহ তুমি উড়িয়ে দাও এই দুঃখ দুর্বলতা গোঁজামিল হুমে ও চেতনে—বহু সৌরবশ পরে এগ্নিই নির্বোধ ছিঁড়বে অশালার উপর বয়্যাপা এই সমাচার জনে শেষের ধনির মত উড়ে চলো হোমোপাথী অশার আকাশে।” (১৮নং)

২। বাটের দশকের কাব্যের যদি মৌলিক চেতনা হয় নৈরাশ্রের অথবা নেতির; তবে সত্তরের দশকের তা হল উজ্জ্বল প্রত্যাশার। তবে অলীক স্বর্গে কবির আর বিশ্বাস নেই। জ্বলন্ত বাণিক রায় উল্লেখ করেছেন—
 ‘স্বর্গের পরিবর্তে পৃথিবীর ও মানুষের ভালবাসার মধ্যেই দেবপ্রসাদ বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছেন।’ কারণ, দে শব্দ নিয়ে বেঁচে থাকে বৃকের গভীরে প্রাণ, স্বর্গের বিকরে বিশ্বাসী। ‘ঈশ্বর কবিতার কবির উপলব্ধি সহজাত বলেই তা অন্তরকে স্পর্শ করে। তাই আমি ‘শাপ’ বলে শেষের ভিতর হাত ঢোকালেই, পুণ্য এসে বুক পেতে পড়ায়। বাস্তবিকই দেবপ্রসাদের কবিতার প্রেম, পৃথিবী ও নির্বাসন ভালবাসার তুলে ওঠে। স্বর্গের সিঁড়ি খোঁজার মোহভঞ্জন বেনারস চেয়ে সত্যাতর—“জলোজ্জ্বলে বড় ভয় চিরকাল রয়ে গেল; হাতে হাত রেখে, হাতছানি বহুদূর নিয়ে যেতে পারে—সেই হাতছানি ছুটন্ত গাড়িতে দেখি—তবে আছে মাঠ—পৃথিবীর মাটি।” (বসন্তে বাতী বদল) অনেকদিন পরে ভালো গীতি কবিতার আশ্বাস দেবপ্রসাদের রচনার পাওয়া গেল। পরতের চলতি মেঘের মত হৃদয়ের সোনালী রোদের মাত্রায় একটা বিঘ্নতা ওড়িয়ে থাকে—অথচ, যা বৃকের ওপর শাবণ ভায় চাপিয়ে ধরন। “ঐক এই পরতেই বৃকের মধ্যে কেমন একটা হাতছানি থাকে।” দাস্যাতিক বাংলাকাব্যে জীবন-বয়সের উষ্ম মকতুমিতে প্রেমের স্বথোক

মল্লভান ভুলে গিয়েছিল। দেবপ্রসাদ সেই হারানো প্রেমের স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। “মুম্বত্ব শীতের রাতে ট্রেন ধরতে, ভূমি ধাক্কিয়ে থাক স্টেশনে। ৩৩ তোমার মূলোরির উলে বোনা কাড়িগানে জড়ানো বুক কেঁপে ওঠে। ৩৩ ওকে বাঁচিয়ে নীলধাম রাখা বাবে মা কি যে বিশ্বাসে ও প্রেমে কবি প্রেমিকার রূপকল্পন অঙ্গুত্তর করেছেন—সেই ভালবাসা ও বিশ্বাসে আমারও ভীক অধর ঠেকাই। আধুনিক জীবন-যন্ত্রণার প্রেমের ছলনা। যেখানে সহজাত, কবি নারীপ্রেমের সেই চট্টল জীলার মর্জন করেন নি। কবির প্রেম রূপের গভীর মল্লকূপ থেকে শীতল পানীত পান করতে চায়, তাই কবির হৃদে আমার সহজে হৃদ মেলাতে পারি। এ ধরনের উজ্জল শিশির বিন্দুর মত একটি কবিতা পুষ্পোপুষ্প উদ্ভূত করার লোভ সামলাতে পারা গেল না।

“সেই নারী আমার ইজিত করেছিল প্রাণের
সেই নারী আমার বিতীর্ণ সবুজ রাতে ধাক্কিয়ে
দিগন্ত বেধিয়েছিল একদিন ;
কৃশাঙ্গর চিত্তেরও সে আমার কাঁধ স্পর্শ করে বলেছিল :
এসো ! কেতের শিশিরে হাটি
তারপর ঘরে ফেরা বাবে ।” (দিগন্ত)

৩। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে নারীর রূপের বহুভাস আর পাওয়া যায় না বলে অনেকের আক্ষেপের স্বীকৃতিস্বরূপ অন্তে পাই। হুজাতা প্রিয়ঃস্বহার “বেলা ও লম্বত” কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পড়তে গিয়ে উনিশ শতকের নারী কবির অধগুপ্তিত প্রকাশ আমার নতুন করে চোখে পড়ল। ধর্ম এই নারী-কবির কাব্যের আলম্বন। কিন্তু এই ধর্ম শাস্ত্রের বেলাকৃষি অতিক্রম করে মানব ধর্মের মহাপন্থে সহজে মিলে যেতে পারে। যে তিনটি বিশেষ গুণে এই কবির কাব্য চিহ্নিত তা হল রোমাণ্টিকতা গভীরতা ও মর্ন্তপ্রীতি। অবশ্য কল্পনার গতি সংকুচিত বলে অথবা বাস্তবের মাধ্যাকর্ষণের টানে আকাশবিহার বিশেষ নেই, কিন্তু বাস্তব খেলাঘরে, যেখানে কিশোরের আলপনা

ও ডেউ এসে আভাত খাচ্ছে—সেখানে কবির রোমান্টিক অভিলার আমাদের আকাশ হারামোয় বেধনা লচকে তুলিয়ে দিতে পারে।

“হলদে রোদের পাল টেনে
নীল লঘুস্তের নৌকা
ঝাউবনের বেলাসূরিতে
লকাল থেকে
ঠান্না পাড়িয়ে রয়েছে।”

এই কাব্যের একটি আশ্চর্য কবিতা “লক্ষ্য” যেখানে বাক্ সংঘমে কবির অতুষ্টি ভাবধর্মের দ্বিগুণ সংহত দীপ্তি লাভ করেছে। “ডুবে গেল কৌমাৰ” —এরকম আশ্চর্য রসধন লঙ্কি সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের আশ্রয়ক ভটিলতার মধ্যেও গুলত নয়। নারী বধন হৃদয় মনের দাহ নিয়ে আকাশকে ছুঁতে চায়, তখন শৈলীর মতো sphere of sorrow-কে অস্বীকার করে skylark-এর আনন্দ লকীত রচনা করে না। তাই স্বর্ধরশিত পাড়ওয়ালা মেঘমালা দেখে কবি বড়ই মৃদু হন তিনি লেগলি স্পর্শ করতে চান,

এই ধরণীর উপর
এট ধুলোর ধরণীর বৃকে
পাড়িয়ে, পাড়িয়ে।”

তাট হুজাতা প্রিয়ঃবদার চেতনার ধরণী লহজেই হুনীল আকাশকে আলিঙ্গন করতে পারে। কবির প্রের যেখানে বৈহিক কামের উর্কে উঠতে পারে না। সেখানেও বেহুপকের মধ্যেও রূপনয় লহজেই ফুটে উঠে। এ ধরনের এক চরংকার কবিতা ‘উবা ভাবনা’। তরুণ স্বর্ধ কামের বলিষ্ঠ আবেগে নিভ্রিতা উবাকে বাহুর পেননে নিপীড়ন করেছে—সেখানে কবি লহজেই মহেশ্বর চেতনার উন্নীত হতে পেরেছেন।

“চুখনের স্পর্শ
ফুলের পাণ্ডিগুলিতে সীতার কেটে
লেগলিকে
রঙিন করে দিয়েছে।”

দু-একটি কবিতার কবি এই প্রত্যয়ের প্রচ্ছন্ন দীপশিখাটিকে হারিয়ে ফেলেছেন তাই রূপদোষ সহজেই সংক্রামিত হয়। একটি উদাহরণ দিই,

"বেলাকৃষির কর্ণসাক্ষ্য বালি ভেসে গেল,
সমুদ্র বসি করলো।
কিছু সামুদ্রিক হাসপালা তার কিছু লামুক।"

আপা করব ভবিষ্যতে স্রীমতি প্রিয়ংবদা তার নারীমনের অকুমাৰ অহুত্বটিকে বিলুপ্তি দিতে চেষ্টা করবেন না। প্রসংগত উল্লেখ করি বৌদ্ধ ধর্মের তাহিকতা।

পাঠকের রূপের উপলব্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। উদাহরণ হিসাবে একটি শাব্য পাণ্ডুর কবিতার উল্লেখ করি, যেখানে কবি ধর্মবিশ্বাসে অটুট থেকেও রূপের সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে পেরেছেন।

"যেদিন আমার উদগ্র ঘনের বৃদ্ধ
তোমার বিপাল বৃকের মাঝে
নির্ভর ও নির্ভর আলোর নিরেছিল,
সেদিন আমি পেয়েছিলাম
আমার প্রিয়তমকে।"

—প্রমথ সেনগুপ্ত

২



আত্মবৃত্ত / অমিয় চৌধুরী / লেখক সমাবেশ / দায় : আট টাকা।

বাংলা উপজাতির বয়েস একশো পেরিয়ে গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। সাহিত্যের একটি শাখার পরিপূর্ণ পুষ্টি এবং বিকাশের লক্ষে এই সময় যথেষ্ট না হ'লেও একেবারে কম নয়। রীতি এবং রীতিহীনতার দ্বন্দ্ব কিংবা সহাবস্থান এখন এতোটাই গা লগ্না ব্যাপার হয়ে গেছে যে, মতুন লেখক যাত্রী হিসেবে নিজেকে কেউ দাবী করলেও, যেনে নিজে একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। কিংবা সেই লেখক শেষে পৌঁছে ক হুঁচকে দেখতে হয়, সত্যিই কিছু আবিষ্কার ঘটলো কি না!

কথাগুলো অমিয় চৌধুরী-র 'আত্মবৃত্ত' লড়ায় আগেই মনে উঁকি দিয়ে-ছিলো। শেষ করার পরে বন্ধমূল হয়ে যায়।

'আত্মবৃত্ত' লেখকের প্রথম উপজ্ঞান। উত্তমপুরুষে লেখা। দৈনিক থেকে তিনি কিছুটা সাহস দেখিয়েছেন এই ভেত্রেই যে, তিনি প্রাণাঙ্গগভাবে নিজের গল্প গোপনানি। বরং নিজেকে আগাগোড়া আড়াল রাখতে পেরেছেন বিরল কুশলতায়। "The author really sides behind his narrator" উদ্ধৃতিটি অনায়াসে তাঁর সম্পর্কে ব্যবহার করা যায়। যে কোন মতুন লেখকের পক্ষেই এটি প্রাথমিক বিষয়।

উপজাতির মূল চরিত্র একজন লতার বছরের বৃদ্ধ। কিংবা তিনিও নয়, তাঁর ভাবনা, নিঃসঙ্গতাবোধ। যিনি প্রাথমিক মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে বাবার পর, মশারীর ভেতর বলে বিনীত রাত কাটান। স্বী-পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ নিয়ে এক ছাদের নীচে বাস করেও যিনি একটি ভিন্ন বীণের বাসিন্দা। অথচ এক উন্মুক্ত জীবনের আত্মতা লাকী হয়েও বিজ্ঞানতার স্বরূপে বন্দীশা। যেনে নিজেছেন। অবশ্যই তাঁর বৃত্ত রচিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ছোঁয়ায়, পংলাপের রেখায়, ঘটনার স্পর্শে। এবং এই সব ঘটনাও সব সময় সামাজিক ব্যাপার নয়, ইতিহাস-রাজনীতি ও কারণা নিয়েছে অনিবার্য ব্যতিক্রম হিসেবে। এই সব কিছুই ছাপ নিয়ে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে তাঁর বৃত্ত। বড়োও হয়েছে ক্রমশ, বিজ্ঞানভাবে। কিন্তু লেখক এই বৃত্ত নির্মাণকারী ছোঁয়ায়-স্পর্শ দিয়েছেন এমন খাপছাড়াভাবে যে, কোন কিছুই যেন শেষ পর্যন্ত দানা বেঁধে উঠতে পারে না, যেন বীণের পারিশাখিকরূপ দেখা হলো না।

বলেই তার স্বতন্ত্র সত্যিকারের অধরা থাকলো। বুকের বড়ো ছেলের দৃষ্টিও যে কারণে বিস্মিত মনে হয় না। লেখক এটি লম্বা এড়াতে পারতেন।

ভদ্রীর দিক থেকে নতুন পথ খুঁজতে চাইলেও ভাবার ক্ষেত্রে কিছু লেখক পুরোনো পথকেই ভালোবাসেন। তৎসম লেখকের যৌক তাঁর এতো প্রবল যে, কখনো কখনো উপস্থাপনের রস অপেক্ষ মনে হয়েছে রীতিমত। তার একটু মম্বনা দিই—“কিন্তু এ কী ভুল সংবৎ শুরু হয়ে গেছে আমার বুকের প্রাচীরে। নিবিরোধ আত্মবৃত্ত দুর্ধর্ষ নৈশ হানায় খেন বিগ্লিট, উষ্ম গুলিতে নিশ্চিত।” (৬৭ পৃঃ) আর একটি—“নীল নরনের আরও সারথের মত নদীর তলে নবজের নিমগ্ন লিপি ক্রমশঃ এবং ক্রমশঃ মুক অধরের নিঃশব্দ ভাবার মত মুটে গঠে। মৌন প্রায় চতুর্দিক।” (৭৬ পৃঃ) অথচ মাঝে মাঝে তিনি আন্দর কিছু পক্ষ লেখেন।

আলোচ্য কনটেস্ট-এর আত্মগত্য রক্ষার এই পক্ষ কতটা সহায়ক হবে, তা নিরে সংশয় থাকে। তবে পটভূমি এবং চরিত্র রচনার ক্ষেত্রে লেখকের নৈপুণ্য রীতিমত প্রশংসনীয়। কিন্তু কাহিনী বরনের শৈথিল্য মাঝে মাঝেই টের পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও, এই উপস্থাপন রচনার যে কিছুটা অচলিত গতিবেগ আছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

ছাপা যোটাছুটি ভালো। যদিও কিছু ভুল নজরে পড়েই যায়।

—অনুলকুমার আচার্য

১

১

প্রাপ্ত পত্র-পত্রিকার স্বীকৃতি

	সংখ্যা।	সম্পাদক	ঠিকানা।
	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫	দেবকুমার বসু	২/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-২
	সেপ্টেম্বর, নভেম্বর- ডিসেম্বর, ১২৭৮	দেবকুমার বসু	ঐ
বাতিগেট	১ম বর্ষ ৮, ২, ১১ ও ১২ এবং ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা।	বিশ্রাণীশ গুহ ও গুডানন্দ দাস	গান্ধীবাগান কলিকাতা-৪৭
সৈনিকের ডায়েরী	নভেম্বর-ডিসেম্বর ১২৭৮	অভিজিৎ ঘোষ ও নির্মল বসাক	২০-ডি, বালিগড় স্টেশন রোড, কলিকাতা-১২
দর্পক	১২শ বর্ষ, ৮য়, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।, ১২৭৮/৭৯	দেবকুমার বসু	২/৩ টেমার লেন কলিকাতা-২
চুম্বী	৮ ডিসেম্বর, ৭৮ ও ১লা ফেব্রুয়ারী, ৭৯ সংখ্যা।	অরুণ চৌধুরী	১০৮ বি, রাস্তা বাহাদুর রোড, কলিকাতা-৩৪
অন্তরীত	পারদ লংকলন ১৩৮৫	হুমায়ূন চৌধুরী	খালদা, পুন্ডলিয়া।
	পরংকালীন সংখ্যা।	সমীরণ ঘোষ	৩, ডেলিভারালস্ লেন, বঙ্কিমপুর, মুর্শিদাবাদ।
প্রাতিদ্বিক	নববর্ষ সংখ্যা।, ১৩৮৫	গুরুদাস মজুমদার	স্টেশন রোড, বেলমুড়ি, হুগলী।
	২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। অক্টোবর, ৭৮	অচিন্ত্য বসু	১৭ নতুনপাড়া, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

সফ্রিটন	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২	উত্তর ত্রিপুরা ও রমাশ্রমিক রায় কর্মকার	৩১১, রামপুর রোড, বীকড়া।
রৌপ্য	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২	শান্তিময় মুখোপাধ্যায় শুভ চট্টোপাধ্যায়	৩২, অরুণাচল, খাগড়া, মুন্সিগাঁও।
২৪। উত্তর মঙ্গল	১ম সংকলন, ১৯৭৮	ক্রান্তি বিশ্বাস	নিউহিল্লী।
২৬। খেয়া	শান্তিনীতি, ১৯৭৮	শেখর চক্রবর্তী, অমিত সেনগুপ্ত, নৃসিংহ দাসগুপ্ত, এ বিভাগ রায়	কানপুর, ইউ. পি. নৃসিংহ দাসগুপ্ত, এ বিভাগ রায়
সপ্তদীপা	পূজাসংখ্যা ১৯৭৮	জীবনময় দত্ত	এ-১২৪, কলকাতা বাগ কলোনি, পাটনা-২০
প্রান্ত	পৌষ ও মাঘ সংখ্যা ১৯৮৫	শান্তিনীতি মুখোপাধ্যায়	১৭২৪, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউহিল্লী।
পার্বত বাংলা	৩য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা, ১৯৭৮	মোঃ আলী কদর	২, কে.এম. রোড, খিনাইদহ, যশোর বাংলাদেশ।
আবেলী	আবিন, ১৩৮৫		দুল্লু আট প্রেস, পাবনা, বাংলাদেশ
কৃষি	১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৯৭৮	কিরোন খান হুস	যশোর, বাংলাদেশ।
আহত নৃ	২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৭২	পবিত্র কামল রসদ	বঙ্গ নং ২, ডাউনলী, রাণেশ্বরী, বাংলাদেশ।
	২৬শে মার্চ বিশেষ সংখ্যা	কালেশ খান কামল	১৩৭, পাহাড়ি হল চট্টগ্রাম বিশ্ব- বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

আবর্তিত সংলাপ	ছড়া / লিমেয়িক সংখ্যা	উদয়মোহন হোসেন ওরফে ড. আলী ভূতি ও বুদ্ধিমান উদয়মোহন রানা	ওরফে ড. আলী রোড রাধানগর, পাবনা বাংলাদেশ
৩৫। যিথুন	৩৪ বর্ষ / ৪র্থ সংখ্যা	পোদ্দার আল হালদা	যিথুন সাহিত্য সংসদ মোবাইলকল চিনিমল এলাকা পোঃ নলডাঙ্গা, বগুড়া, বাংলাদেশ
দুগ্ধ	১ম বর্ষ / ৬ষ্ঠ সংখ্যা	এল. এম. নজরুল ইলদাম	মিউ সীমাপুরী দিল্লী-৩২
মনসিং	প্রতিষ্ঠিত সংখ্যা মাঘ-১৫, ৮৪	কর্ণালিক লসকার	এ. কে. কল্লুল হক রোড, মনোহরপুর, কুমিল্লা বাংলাদেশ
শিল্প ও সাহিত্য	এপ্রিল-মে ১৯৭২	অনিলাকুমার বসু	৩/২এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-২৫
সম্প্রতি	বঙ্গবঙ্গালীন সংকলন গ্রন্থকালীন সংকলন	প্রণব মাউতি	অভিচল, পোঃ কাথি, মেদিনীপুর
ভারতবাসী	৬ষ্ঠ বর্ষ / ২২ সংখ্যা	ডঃ পরমানন্দ হালদার	১৮এ, টেমার লেন কলিকাতা-২
বঙ্গবাসী	দ্বি-সাপ্তাহিক	নির্মল লেন গুপ্ত	২/১ রাম বাসার লেন, কলি-১২
অনুভবলোক	বিশেষ বঙ্গ সংখ্যা	সমীপ মজুমদার বিদ্যুৎ বসু	অনুভবলোক সাহিত্য পরিষদ স্টেশন রোড, মেদিনীপুর।
সাপ্তাহিক	১ম বর্ষ সংকলন- ১৯৮৬	বোম্বের্স মাউতি ভাণ্ডার বাসিক অনেক দূর অধিকারী	সাপ্তাহিক কেন্দ্র, পোঃ কলি- নগর, ২৪ পরগণা

হঠাৎ	১ম বর্ষ / ১ম সংখ্যা	মাহমুদ কামাল	পাবলিক লাই- ব্রেরী টাওয়ার বাংলাদেশ
প্রিয় শির			পি-২৭ মিউজিয়- ম পোঃ গড়িয়া, কলিকাতা-৬৪
সাপ্তাহিক	১৩'ম বর্ষ ৫ম / ৬ষ্ঠ	অজয় চট্টোপাধ্যায়	ডারমও হারবার ২৪ পরগণা।
চুটপাখ	সংখ্যা		
অনিচ্ছ জনক	১ম বর্ষ / ১ম সংখ্যা	শ্রীমতী রত্নী দাস	নন্দিতা পাব- লিকেশন, ১ / ১, ডান্সিটার্ট রো, কলিকাতা-১
উনিশে মে	উদ্বোধনী সংখ্যা	পরিমল চক্রবর্তী	কে. এল. কুটির আপার লাবান, শিলঙ, ৭২০০০৪

ওপরের ঐ পত্র-পত্রিকাগুলোর বেশীর ভাগই হয় কবিতা-পত্র নয়তো তাতেও রয়েছে কবিতার প্রাধান্য। কিছু প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতাও চোখে পড়লো। যেমন, 'লোনা'—হরপ্রসাদ মিত্র (প্রাতিশ্রিক), 'কেউ বলেনি'—গোরাগ ভৌমিক (সাহিত্য লেভু), 'নদীর দু পাড় ডাঙে'—শক্তি চট্টোপাধ্যায় (মহা), 'কিরে কিরে ভাক'—রনীশ ঘটক (স্বরস্বর) প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্যান্যদের কারো কারো লেখার ও উজ্জলতার দাবির দেখা যায়। তবে মনে হয় শুধু দুর্বোধ্যাতাই নয়, কবিত্বের মতো কবিতার আধিক্যের ক্ষেত্রেও সাধারণ পাঠক আধুনিক কবিতা-বিমূখ। এ বিষয়ের আলোচনার স্বপ্ন কুমার গোস্বামীর—'আধুনিক কবিতা: দুর্বোধ্যাত' (প্রাতিশ্রিক) ছোটোর মধ্যে সং ও সুলভ; লকে অনিল ঘোষের 'বিষয় দুর্বোধ্যাত: কবি ও পাঠকের মধ্যস্থতি' (এবং তালিকা), ও 'কবিতা আলোচনের প্রেরণ'—চরীচ চক্রবর্তী (লৌক) পড়ে নেওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মিত্র, মনসিঙ্গ, আরণ্যক প্রভৃতি পত্রিকাগুলি সহকালীন কবিতা ও কবিতা-ভাবনার সমৃদ্ধ।

ছোট পত্রের আলিনার বলিষ্ঠতার দেখা পাওয়া যায়। শুভ চট্টোপাধ্যায়ের 'কুখ্য' (স্বরস্বর) বড় বেশী উলঙ্গ। মানস চক্রবর্তীর 'তিনটি বাস্তব চরিত্র ও কিছু সংরক্ষিত মুহূর্ত' (সপ্তদীপা) বাস্তবিক।

নাটক প্রায় নেই বললেই চলে। তবে এ ক্ষেত্রে ডাঃ হীরেন চট্টো-
পাধ্যায়ের নাট্যালোচনা 'প্রসঙ্গ : নাটক' (সমিতি) বহু পরিসরে বার্ষিক।
কিন্তু শুধুমাত্র নাটকীয়তাই নয়, বক্তব্যের স্বচ্ছতা, সাবলীল প্রকাশভঙ্গি ও
সুষ্ঠু পরিণতিও সার্থক নাটক লেখার ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ। অজ্ঞাত
প্রবন্ধের মধ্যে ডাঃ অরুণ সান্যালের 'ভাষা শিক্ষা মৌলিক প্রসঙ্গ' (বর্ষক) ও
সংক্রেটিসে প্রকাশিত দরদাস আচাৰ্য্যের 'চীন ও ভারত (১২৫০-১২৭৫)
চিন্তার ঐতিহাসিক যোগ্য। শিক্ষানুষ্ঠী থেকে প্রাকৃতিকাল পরীক্ষা কি তুলে
দেওয়া উচিত?—পূর্ণেন্দু ঘোষ (বেঙ্গা) ও এট 'অবিচারিতত্ত্বা'—সত্যী
চট্টোপাধ্যায় (সাহিত্য সেতু) দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তবে যেন-তেন-প্রকাশের ২/৪টে লেখা ছোপাড়া ক'রেই একটি পত্রিকা
প্রকাশের প্রয়াস ও নায় ছাপাবার প্রবণতা সর্বদা সমর্থনীয় হ'তে পারে
না। যে কোনো প্রচেষ্টার পেছনেই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আন্তরিক প্রবৃত্তির
বাক্য থাকে চাই। অনেকগুলো পত্রিকার গায়েই অসহ ও অসহোযোগ
ছাপ ফুটতে। ফলে দৃষ্টিকটু তো বটেই, ছাপার ভুলের নামাবলী ভড়ানো
পত্রিকা পাঠে পাঠকের অনীহাও স্বাভাবিক। কোনো কোনো পত্রিকার
আবার সম্পাদকের নামটিও খুঁজে পাওয়া পেল না ('যহরা'); এমন কি
পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখও নেই। আশ্চর্য আধুনিকতা!—যেমন 'তমোহা'।

সর্বশেষে, অনেক পত্রিকাই লিটল ম্যাগাজিনকে বাঁচিয়ে রাখবার
আজ্ঞান জানিয়েছে (ব্যতিরেক) কিন্তু শুধু 'ডাক দিয়ে বাই'—তেই তো আর
এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া বাবে না; চাই বিত্ত ও বাস্তব পরিকল্পনা।
আজকের কালজ ও ছাপাখানার খাল মেটাতে ও বাজারী পত্রিকার সঙ্গে অসম
বুদ্ধে সম্মিলিত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন কিছু সং এ নিঃস্বার্থপর
লোকের এগিয়ে আসা। এ বিষয়ে কৃষ্ণা বসন্ত 'দৃষ্টিপাত' (সাহিত্য সেতু)
উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

—সাপন কুমার বসু

কৃশান্ত দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

শারদীয় (১৩৮৬) রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

৫ সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত

পশ্চিমবঙ্গ

(বাংলা সাপ্তাহিক)

প্রচার-সংখ্যা : ৭০,০০০

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা • বার্ষিক সভাক—১০ টাকা



পশ্চিম বঙ্গাল

(হিন্দী পাক্ষিক)

প্রচার-সংখ্যা : ৫৫,০০০

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা • বার্ষিক সভাক—২৫০ পয়সা



ওয়েষ্ট বেঙ্গল

(ইংরেজী পাক্ষিক)

প্রচার-সংখ্যা : ১০,০০০

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা • বার্ষিক সভাক—৫ টাকা



এছাড়া, সাপ্তাহিক পাক্ষিক 'পছিম্ বাংলা'

এবং উর্দু পাক্ষিক 'মগরেবী বঙ্গাল'

পত্রিকা দুটিতেও বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয়।



বিজ্ঞাপনের দার ও অন্যান্য শর্তাদির জন্য

নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাষ্ট্রটাস বিল্ডিং, কলিকাতা-৭০০০০১

আই. সি. এ. ৯২৪৭। ৭২